# মমতার ইমাম বন্দনা
# এবং
# প্রণামী ২৫০০ টাকা



# মমতার ইমাম বন্দনা
# এবং
# প্রণামী ২,৫০০ টাকা

সম্পাদনায়

অরুণ ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

**বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র**

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

**প্রকাশক ঃ**
অরুণ ঘোষ
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

**প্রথম প্রকাশ ঃ** জুন, ২০১২

**বর্ণস্থাপন ঃ**
**জেএমএস এন্টারপ্রাইজেস্**
১৫সি, ভুবন সরকার লেন (৩য় তল)
কলকাতা-৭০০০০৭

**মুদ্রণ ঃ**
**ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**
১১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

**মূল্য ঃ** ১৫ টাকা মাত্র

লক্ষ্য পঞ্চায়েত ভোট, জল্পনা * মামলার হুমকি বি জে পি'র

# ইমামদের মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

*সৌজন্যে : বর্তমান, ৪ এপ্রিল, ২০১২*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা :** মসজিদের ইমামদের মাসে আড়াই হাজার টাকা করে সাম্মানিক ভাতা দিতে চায় রাজ্য সরকার। শুরুতে প্রায় ৩০ হাজার ইমামকে এই ভাতা দেওয়ার কথা মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার ইমামের সমাবেশে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী চান রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে এই ভাতা দিতে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার ওয়াকফ বোর্ডকে দিয়ে দেবে। তবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে সরকারকে পরামর্শ দিতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ নিয়ে কোনও বিতর্ক হোক চাই না। আইন বাঁচিয়ে এটা করতে চাই। টাস্কফোর্স সুপারিশ করলে পনেরো দিনের মধ্যে এই ঘোষণা কার্যকর করতে চায় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবটা আমি চাপিয়ে দিচ্ছি না। ভুল বুঝবেন না। ভুল বুঝলে দুঃখ পাব। ধর্ম যদি অনুমোদন করে তবেই হবে। না হলে হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, বছর ঘুরতেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তায় যে ভাটা পড়েছে, পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, ২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনই হতে যাচ্ছে সেমি-ফাইনাল। তাই পঞ্চায়েত দখলই আপাতত মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে ইমামদের সামাজিক গুরুত্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে।



*মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ইমামদের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আপত্তি তুলেছে বি জে পি। দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা বলেন, এটা প্রশাসনকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করার নির্লজ্জ নিদর্শন। ক্লাবগুলিকে হাত করার জন্য কিছুদিন আগে টাকা দেওয়া হয়েছে। এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে ইমামদের কাছে টানার চেষ্টা হল। রাহুলবাবু বলেন, আমরা আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছি। প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে

যাব। সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ করে রাহুলবাবু বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠান মঞ্চে কংগ্রেসের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য মন্তব্য করতে চাননি। নিরাপদ অবস্থান নিয়েছে সি পি এমও। কেরলের কোঝিকোড়ে দলের পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে যাওয়া বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন। সূর্যবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও সংখ্যালঘুদের বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কথা রাখেননি।

এদিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করেছিল রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম। মুখ্যমন্ত্রীই সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। মঞ্চে উপবিষ্ট ইমামদেরই কেউ কেউ দাবি করেন, দেশে কেন, বিদেশেও সরকারি উদ্যোগে এমন সম্মেলনের নজির নেই। তাঁদের অনেকেই এ জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁরা বলেন, ইমামদের কথা শোনার জন্য আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন উদ্যোগ নেননি। কয়েকজনের ভাষণে ছিল রাজনীতির কথা। একজন তো পঞ্চায়েত ভোটে সি পি এমকে হারানোর ডাক দেন। আবার ভিন্ন সুরও শোনা যায়। আমরা সি পি এম, কংগ্রেস বা তৃণমূল কোনও দলের নই, বলেন এক ইমাম।

সম্মেলনে যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল। অনুষ্ঠান সফল করতে প্রশাসনও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইমামদের যাওয়া-আসার জন্য বহু জায়গায় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসন গাড়ির ব্যবস্থা করে। অনুষ্ঠানে খাবারের ব্যবস্থাও ছিল। তবে মঞ্চে হুগলির ফুরফুরা শরিফের ত্বহা সিদ্দিকি এবং অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের রাজ্য সভাপতি কারি ফজলুর রহমানের অনুপস্থিতি অনেকেরই নজর কাড়ে। দু'জনকেই অবশ্য টাস্কফোর্সের সদস্য হিসাবে রাখার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফজলুর রহমান বলেন, আমাকে ডাকেনি, তাই যাইনি। তাঁর কথায়, ইমামদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণার পিছনে নিশ্চয়ই সরকারের কোনও মতলব আছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হয়েছিল। ইমাম ভাইয়েরা রুখে দিয়েছেন।

সাম্মানিক ভাতার কথা ঘোষণার পাশাপাশি ইমামদের নিখরচায় জমি, বাড়ি এবং তাদের সন্তানদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ১০ মাসেই সরকার সাচার কমিটির সুপারিশ কার্যকর করেছে। এদিন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অমিত মিত্র এবং রেলমন্ত্রী মুকুল রায়ের মতো মন্ত্রী ও নেতারা মঞ্চে হাজির ছিলেন। দলের এক নেতার কথায়, গুরুত্বপূর্ণ নেতা-মন্ত্রীদের হাজির করে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের বার্তা দিতে চেয়েছেন, তাদের স্বার্থকে তাঁর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

## ইমাম ভাতা : ভয়ানক রাজনীতির সূচনা করলেন মমতা

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

দেশে, সম্ভবত বিশ্বেও, এই প্রথম ইমাম সম্মেলন করলেন কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় বিশ হাজার ইমামের সামনে মাসিক ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করদাতাদের টাকায় সরকারের ধর্মীয় দাতব্য। এ নিয়ে রাজ্যের

রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও নির্বাচিত সরকার সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে এমন ঘোষণা করতে পারে কি না, তা নিয়েও প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে তুমুল আলোচনা হচ্ছে। সামাজিক প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক। কারণ, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পীড়া বহনকারী পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে তোষণ এবং প্রশ্রয়ের রাজনীতির সুদূরপ্রসারী পরিণাম রয়েছে। ভোটব্যাংকের রাজনীতিসর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিণাম অনুধাবন করেও চোখ বুজে রয়েছেন, শুধুমাত্র কিছু স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায়। কিন্তু যে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তিনি এই আগুনে খেলায় নেমেছেন তার দৈত্যরূপী ভয়াবহতার একবার বোতলমুক্তি হলে আর রক্ষে নেই। মমতা সে কথা মনে রেখেছেন কি?

ইমাম সম্মেলনের মঞ্চটির বিবরণ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। পাঠককুলকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির জানান দিতে এটি জরুরি। নেতাজি ইনডোর কানায় কানায় ইমামে পূর্ণ। প্রায় ২০ হাজার ইমাম সেখানে হাজির হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বুজুর-এ-আলার ডাকে। মঞ্চের পিছনে বড় হরফে লেখা সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের নাম। অশোকস্তম্ভ এবং মমতা মুখ। মাইক ধরে ফেজটুপি পরিহিত সরকারি অফিসারের বারংবার ঘোষণা, নারা-এ-তকদির, আল্লাহু আকবর। গমগমে ইনডোর স্টেডিয়াম। সরকারি মঞ্চ হলই বা, এক মৌলানার গম্ভীর ও সুরেলা কণ্ঠে কোরান পাঠ সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করে দিচ্ছিল। একের পর এক মৌলানার ভাষণ। এক, ইমামদের আহ্বান, আগামী পঞ্চায়েত ভোটে মমতাকেই ভোট দিতে হবে। মূলত দুটি দাবি উঠে এল। ইমামদের সন্তানদের জন্য ফ্রিতে শিক্ষা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইমামতি করে পেটভরণ হয় না, তাই সরকার কিছু মাসিক সহায়তা করুক। ইমাম সম্মেলনকে কেমনভাবে দেখছেন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা? উত্তর দিনাজপুরের এক মৌলানা তাঁর ভাষণে বলেন, আমি চার বছর মদিনার ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আরবের বাদশাহকে ইমাম সম্মেলন করতে দেখিনি। পাশের মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশেও কখনও ইমামদের এমন সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি। তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যা করলেন, তা অভূতপূর্ব। আল্লাহর কাছে সর্বদা এমন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দোয়া করতে হবে। ইনডোর জুড়ে তখন একটিই ধ্বনি, নারা-এ-তকদির, আল্লাহু আকবর।

সেদিনই মহাকরণে মমতার মন্ত্রিসভার এক বরিষ্ঠ মন্ত্রীর সঙ্গে ইমাম ভাতা নিয়ে সাংবাদিকদের কথা হচ্ছিল। সরকারের এমন পদক্ষেপ কি ঠিক হল? সরাসরি ইমামদের নামে অর্থসাহায্য করে কি বিতর্ক বাড়ানো হল না? ওই মন্ত্রীর জবাব, আপনারা চেয়ারের ও প্রান্তে বসে যা খুশি বলতে পারেন। চেয়ারের এ প্রান্তে বসে আমি বলব, ঠিক করেছেন মমতা। হ্যাঁ, আমরা মুসলিম সমাজকে তোয়াজ করছি। কারণ, আমরা রাজত্বে এসেছি এবং ক্ষমতায় থাকতে চাই। মুসলিম সমাজ একসঙ্গে ভোট দেয়। ইমামরা ওই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের জন্য সরকার কিছু করলে যদি আমাদের ক্ষমতায় থাকাটা নিশ্চিত হয়, তাহলে অন্যায় কোথায়? অন্যদিকে, এ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি একজোট হয়ে ভোট দেয়? ওদের তো ৩৬ জন থাকলে ছ'টা গ্রুপ। সেই কারণেই মুসলিমদের তোয়াজ করছি আমরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের অর্ধেকটা এই সম্মেলনেই করে ফেলেছেন মমতা। মাস্টার স্ট্রোক। যিনি এই কথাগুলি বলছিলেন, ইদানীংকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অতীব ঘনিষ্ঠ। তাঁর অভিমতের রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে।

ইমাম সম্মেলন ও ভাতাঘোষণার যে যুক্তিই খাড়া করা হোক না কেন, তা সর্বার্থে বেআইনি।

কারণ, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশে কোনও সম্প্রদায়কে ধর্মীয় বিচারে কোনও সুবিধা কোনও সরকার দিতে পারে না। তা সংবিধানবিরোধী। সংবিধান সমস্ত সমাজকে সমান মর্যাদা দিয়ে দেখার অধিকার সরকারকে দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্যও সরকার যদি বিশেষ কিছু করতে চায়, তাহলে সমস্ত সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হতে হবে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর মানে মুসলিম উন্নয়ন দপ্তর নয়। এই দপ্তর সামগ্রিকভাবে মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের ধর্মীয় প্রধানদের জন্য কোনও দান খয়রাতি করতে পারেন না। করা যায় না। অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু করা হবে বলে এখনও অন্তত মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওয়াক্‌ফ বোর্ড এই টাকা দেবে। সরকার দেবে না। এটা কোনও যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থান নয়। কারণ, ওয়াক্‌ফ আইন অনুযায়ী বোর্ডের কাজ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। ইমামদের মাসিক ভাতা দেওয়া নয়। তাছাড়া যেই দিক, অর্থ তো যাচ্ছে আপনার আমার মতো সাধারণ করদাতাদের থেকে। আমরা তো কোনও ধর্মীয় বিচার থেকে কর দিই না। সেই টাকায় ধর্মীয় দাতব্য করদাতারা মানবেন কেন?

ইদানীং পুরোহিতরাও নাকি মাসিক ভাতা পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যান্য দাবিদাওয়া নিয়েও সরব হচ্ছেন। ইমাম সম্মেলন করা বা ভাতা ঘোষণা করার মতো পদক্ষেপের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। পুরোহিতদের পালটা ভাতা দাবি তারই উদাহরণ। ইমাম সম্মেলন ও পরবর্তী পদক্ষেপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘুদের মসিহ হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছেন। কিন্তু ভাবুন তো, সেদিন নেতাজি ইনডোরে যা হয়েছে, মমতা যদি ঠিক তার উল্টো ঘটনা ঘটাতেন? অর্থাৎ ২০ হাজার গেরুয়াধারী, তিলক-কাটা সাধু-পুরোহিতের সম্মেলন। সেখানে সরস্বতী বন্দনা বা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হচ্ছে। মঞ্চে মমতাকে পুরাণের পদ্ধতি মেনে অভিষিক্ত করা হচ্ছে। পুরোহিতরা ভাগবতপাঠ করছেন। আর মাঝেমধ্যেই স্টেডিয়ামজুড়ে আওয়াজ, 'জয় শ্রীরাম', 'হর হর মহাদেব'! তখন কী বলা হত মমতাকে'? তাঁকে কি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মসিহ বলা হত? নাকি এক চরম সাম্প্রদায়িক নেত্রী বলে প্রতিপন্ন হতেন? বলা ভালো, এমন অনুষ্ঠানে যাওয়ার হিম্মত কোনও 'সেকুলার' নেতা-নেত্রীর হবে না। আসল বক্তব্য হল, আর এস এস-বি জে পি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে নিয়ে যা করে, মমতা মুসলিম সমাজকে নিয়ে একই জিনিস করেছেন। যদি মোহন ভাগবত, লালকৃষ্ণ আদবানিরা সাম্প্রদায়িক হন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন কেন? কিন্তু তথাকথিত 'সেকুলার' দলগুলির কারও হিম্মত নেই, মমতার এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা করার। এমনকী এ রাজ্যে বি জে পিরও সে ক্ষমতা নেই। তারাও ইদানীং দেখছি, 'সেকুলার', 'সেকুলার' ভাব দেখাচ্ছে।

কিন্তু মমতা যা করছেন, তা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে এক ভয়ংকর অভিমুখ তৈরি করছে। মুসলিম ভোটের জোরে ক্ষমতায় পৌঁছানোর আরও একটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। সেখানে মুসলিম ভোট পেতে কংগ্রেস সংরক্ষণের দাবিতে সরব হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের ধমক খাওয়ার পরও উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বার বার মুসলিম সংরক্ষণের কথা বলেছেন। ফল কী হয়েছে, সবাই দেখেছে। এমনকী তাঁর স্ত্রীও ভোটে হেরে গিয়েছেন। বি জে পি এবার উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে টু শব্দটিও করেনি। অযোধ্যা নিয়ে কুমিরছানা দেখানোর রাজনীতি

উত্তরপ্রদেশের মানুষের পছন্দ হয়নি। অযোধ্যাতেও হেরেছে বি জে পি। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব নতুন উত্তরপ্রদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। মানুষ ধর্মীয় বিচারে ভোট দেয়নি। উন্নয়নই ভোটারদের অগ্রাধিকার পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, ইমাম তৈরির আদর্শ কেন্দ্র দেওবন্দ কিন্তু ওই রাজ্যেই। সেখানেই ফতোয়া মেনে ভোট হয়নি, আর পশ্চিমবঙ্গে হবে?

দুর্ভাগ্য হল, আমাদের দেশে মুসলিম সমাজ এখনও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ভোটব্যাংক ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনেতাদের ধারণা হল, ভোটের আগে কিছু ফিরিস্তি দিলেই মুসলিমরা হই হই করে ভোট দিয়ে দেবেন। মনে রাখতে হবে, গত বিধানসভা ভোটে মুসলিমরা এককাট্টা হয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। তার কারণ তারা সিপিএমকে তাড়াতে চাইছিল। গত ৩৪ বছর ধরে সিপিএম মুসলমান সমাজকে নানা ভাগে ভাগ করে রেখে এবং কোনও কিছু না করে ফায়দা লুটেছে। কিন্তু মমতা মুসলিম ভোট পেতে যা করছেন, তাতে এই সমাজেরই ক্ষতি হচ্ছে। এ রাজ্যের কোনও শিক্ষিত মুসলিম পরিবার চায় না, তাদের ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ুক। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ১০ হাজার মাদ্রাসা খুলবেন।

প্রশ্ন হল, কি দরকার এত মাদ্রাসা খোলার? যদি সত্যিই মুসলিমদের উন্নতি চান, তাহলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল গড়ুন। আই টি আই নির্মাণ করুন। মাদ্রাসা গড়ে মুসলিম সমাজের উন্নতি হবে না। মুসলমানদের প্রয়োজন হলে বিনাপয়সায় শিক্ষিত করুন। আর্থিক হাল ফেরাতে কাজের ব্যবস্থা করুন। আরও মুসলিম সমাজ থেকে যাতে আরও বেশি সংখ্যায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, গবেষক বেরিয়ে আসে তার ব্যবস্থা করুন। আর যোগ্য মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা যাতে সরকারি চাকরি পায় সেটা দেখুন। তাহলেই মুসলিমদের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। ইমামদের ভাতাপ্রদানের সিদ্ধান্ত সমগ্র সমাজের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে বলে মনে হয় না। এটা একটা প্রলোভনমূলক প্রকল্প। এ ধরনের প্রকল্পে লোভ বেড়ে যায়, আশ মেটে না। শুনেছেন তো, ইমামরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইমাম বানাতে চান না, তাই বিনাপয়সায় উচ্চশিক্ষার দাবিতে তাঁরা সম্মেলনে সরব হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ভারতের মতো দেশে সমাজের সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধৈর্য, বিবেচনা এবং সহনশীলতার উপর। যা কোনও মতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রীর কোনও পদক্ষেপ যদি রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবেগে নাড়া দেয়, তাহলে তা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করতে বাধ্য। সত্যিই এর পরিণাম ভয়ানক হতে পারে।

ইমাম ভাতা ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে রাজ্যের মানুষের ধারণা নিয়ে একটি উদাহরণ না দিলেই নয়। মিনিবাসে কয়েকজন যাত্রীর আলোচনায় কান যাচ্ছিল বার বার। আলোচ্য ওই ইমাম সম্মেলন। খবরের কাগজ হাতে এক যাত্রীর সরস বক্তব্য, ভাই, পরিবর্তনের পর দেখছি ওনার নামও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কী! কী হয়েছে? উৎসুক প্রশ্ন অন্যজনের। মমতা এখন মমতাজ হয়ে গিয়েছে। মিনিবাসে তখন হাসির রোল। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু এর গভীরতা মারাত্মক। মুখ্যমন্ত্রী এটি স্মরণে রাখবেন।

রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আপনার সম্পর্কে কী ভাবছে, সেটা বোঝাও জরুরি। তারাও তো ভোট দেয়।

*সৌজন্যে : বর্তমান, ১০ এপ্রিল, ২০১২*

# ইমামদের ভাতা কেন, মমতাকে তোপ

প্রবীণ তোগাড়িয়া : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** ইমামদের জন্য ভাতা ঘোষণার বিরুদ্ধে এবার সরব হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারত সেবা সংঘ। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সিদ্ধান্তকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া। শুক্রবার কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি সভায় তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের দেওয়া কর কেন ইমামদের পকেট ভরার জন্য দেওয়া হচ্ছে? হিন্দু পুরোহিত বা যুবকরা কী দোষ করেছে? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে।

শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, আক্রমণের নিশানা থেকে রক্ষা পাননি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরাও। পরিষদের ওই কর্মকর্তা বলেন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী ইমামদের জন্য ২৫০০ টাকা করে দিচ্ছেন। বিহারে নীতীশ কুমার মুসলমান ছেলে-মেয়েদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। আর সদ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া অখিলেশ যাদব ৩০ হাজার টাকা করে দিচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন, কেন হিন্দুদের এই অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে না? যদি এক সম্প্রদায়কে টাকা দেওয়া হয়, তাহলে অন্যদেরও দিতে হবে।

সভায় তিনি মমতাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। বলেন, ইমামদের জন্য ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বে কোনও মুসলমান দেশে এই সুবিধা দেওয়া হয় না। ধীরে ধীরে রাজ্য ও দেশকে পাকিস্তান, বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন কিছু নেতা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমালোচনা থেকে বাদ যাননি প্রধানমন্ত্রী থেকে সনিয়া গান্ধীও। পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ, দেশ বা রাজ্যকে মুসলমানরাই চালাচ্ছেন। হিন্দুরা ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ও বি সি, এস, সি এবং এস টি'দের জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৩ শতাংশ করা হয়েছে। ওই চার শতাংশ মুসলমানদের জন্য রাখা হয়েছে।

উর্দুকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেরও নিন্দা করা হয় সভায়। আগামী দিনে বড়সড় আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই প্রবীণ নেতা। 'আমারও ২৫০০ চাই' এই নামে আগামী ১ থেকে ৭ মে বিভিন্ন গ্রামে প্রচার চালানো হবে বলে জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি। *সৌজন্যে : বর্তমান, ২১.৪.১২*

# বারাসাতেও সংখ্যালঘুদের কাছে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

**মমতার সামনেই কটূক্তি চিরঞ্জিতকে**

**বি এন এ, বারাসাত:** বারাসাতে এসেও সংখ্যালঘুদের কাছে 'কল্পতরু' হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বারাসাত স্টেডিয়ামে জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের হয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড, ঋণদান কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই মুখ্যমন্ত্রী এমন কল্পতরু হয়েছেন।

কয়েকদিন আগেই ইমামদের মাসিক আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এদিন তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করলেও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বামফ্রন্ট সরকার গত বছর মাত্র ৫২ হাজার ৯১৬ জনকে স্টাইপেন্ড দিয়েছিল। আমরা গত দশ মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৮৪৬ জনকে তা দিয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার স্টাইপেন্ড ও ঋণ দিয়েছিল মাত্র তিন লক্ষ সংখ্যলঘু ভাইবোনকে। আমি গত দশ মাসে সেই সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষতে নিয়ে গিয়েছি। আরও দেব।



*সোমবার (৯ এপ্রিল, ২০১২) বারাসাতের সভা মঞ্চে মমতা*

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিগমের চেয়ারম্যান আবু আয়েশ মণ্ডল, রেলমন্ত্রী মুকুল রায়, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সংসদ সদস্য কাকলি ঘোষদস্তিদার, হাজি নুরুল ইসলাম প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের সুবাদে দীর্ঘদিন পর বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিৎকে প্রকাশ্য জায়গায় দেখা গিয়েছে। তা নিয়ে অবশ্য উপস্থিত দর্শকরা কটূক্তি করতে ছাড়েননি। দর্শকাসন থেকে তাঁরা চিরঞ্জিৎকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ফের ক'মাস পরে মঞ্চে আপনাকে দেখতে পাব? আপনাকে তো বারাসতের মানুষের পাশে দেখা যায় না!' কেউ আবার এক ধাপ এগিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, 'ওই যে আমাদের বিধায়ক চিরঞ্জিৎবাবু মঞ্চে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করুন তো বারাসাতের কী সমস্যা আছে? উনি কিছুই জানেন না। মঞ্চের শোভা বাড়াতে বসে আছেন।' পরে এ নিয়ে চিরঞ্জিৎবাবু সাংবাদিকদের বলেন, আমি বারাসাতে নিয়মিত আসি। বারাসাতের মানুষের সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ আছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ১০ হাজার অনুমোদনহীন মাদ্রাসাকে আমরা অনুমোদন দেব। এ জন্য যা নিয়মকানুন আছে, তা শিথিল করা হবে। কী করে সব নিয়ম সব মাদ্রাসা মানতে পারবে? তাই আমরা ১০ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে সকলকে আমরা এখনই টাকা দিতে পারব না, আমাদের ২২ হাজার কোটি টাকা সুদ দিতে চলে যায়। এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও বিশেষ অনুদান পাইনি। 'তাই টাকা দিতে না পারলেও আমরা অনুমোদন দিয়ে দেব। তাছাড়া মুসলিম বা অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাইবোনদের জন্য প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু ভবন তৈরি করা হবে। সেখানে সরকারি অফিসাররা থাকবেন। তাঁরা সংখ্যালঘুদের সব রকম সাহায্য করবেন। এদিনই বারাসতে রাজ্যের প্রথম সংখ্যালঘু ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে কেউ ভূমিহীন থাকবে না। 'নিজ ভূমি নিজগৃহ' প্রকল্পে সকলকে জমি ও বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। হাড়োয়ায় আই আই টি তৈরি করা হবে। বসিরহাট ও বারাসাত স্টেডিয়ামকে উন্নত করা হবে। তার জন্য বসিরহাটের এম পি হাজি নুরুল ইসলাম এক কোটি টাকা ও বারাসাতের এম পি কাকলি ঘোষদস্তিদার এক কোটি

টাকা সংসদ সদস্যের তহবিল থেকে দেবেন। এছাড়াও জেলার খেলাধূলোর মান বাড়াতে জেলার সমস্ত তৃণমূল বিধায়ক পাঁচ লক্ষ টাকা করে জেলাশাসকের কাছে জমা রাখবেন। ওই টাকায় জেলার খেলাধূলোর মান বাড়ানো হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করায় রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েত ভোট। গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের মতো আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের দিকে টানতে মুখ্যমন্ত্রী এখন কল্পতরু হয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যা, তাতে ঘোষিত প্রকল্পগুলি আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। *সৌজন্যে : বর্তমান, ১০.৪.১২*

## ইমামদেরকে দান খয়রাতি, মমতা ব্যানার্জী ও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য

মমতা ব্যানার্জী সব সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বড় বড় কথা বলে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির কাছে তিনি অত্যন্ত লজ্জাকর আত্মসমর্পন করলেন। এই নির্লজ্জ তোষণ পশ্চিমবঙ্গের যে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করবে—তা অতি সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর স্তাবকবৃন্দ সে কথা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ত্রিশ হাজার ইমামকে মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মমতা গত ৩-এপ্রিল কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ইমামদের সভায়। সব সীমা ছাড়িয়ে গেল না কি? সরকার ডাকছে ইমামদের সভা সরকারি খরচে। সরকারের এই অধিকার আছে কি? ইমাম কাকে বলে? যিনি মসজিদে নামাজ পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় ইমাম। অর্থাৎ তাঁরা একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকর্তা। কোন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের জন্য সভার আয়োজন করা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুমোদন করে কি? এই যদি ধর্মনিরপেক্ষতা হয় তা হলে সাম্প্রদায়িক কাকে বলে—কুণাল ঘোষরা জনগণকে বুঝিয়ে বলবেন কি? ইমামদের কাজ মসজিদে নামাজ পরিচালনা। তার সঙ্গে সরকার পরিচালনার কী সম্পর্ক? ইমামদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া সরকারের কোন্ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? তাছাড়া, ইমামরা গরিব একথা মমতা দেবীর সরকার কি করে জানলেন? বিগত দশ বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গে মসজিদগুলোর চাকচিক্য বেড়েছে না কমেছে? মসজিদগুলির আয়তন ও তলা (Floor) বেড়েছে না কমেছে, মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে? যে কেউ খোলা চোখে তাকালে দেখতে পাবেন, সারা রাজ্যব্যাপী মসজিদের সংখ্যা ও জৌলুসের বিপুল বাড়বাড়ন্ত। তা হলে তার ইমামরা গরিব হয় কী করে? কোনো সরকারী বা বেসরকারী সার্ভে হয়েছে কি? সেই সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে কি মমতা দেবী জেনেছেন যে ইমামরা গরিব! এমনকি যে সাচার কমিটির সুপারিশের দোহাই দিচ্ছেন মমতা, সেই সাচার কমিটিও সাধারণ মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কথা বলেছে, ইমামদের নয়। অথচ মমতাদেবী জেনে গেলেন যে, আহা-রে! ইমামরা বড় কষ্টে আছে। শুধু জেনেই গেলেন না, তার উপর বছরে ৯০ কোটি টাকার দান খয়রাতি খুলে দিলেন—এটা কি হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্য হয়ে গেল নাকি! এই কি পরিবর্তন?

আর ইমামরা যদি কষ্টেই থাকেন তার দায় কার? কি ভাবে সরকারের উপর তার দায় বর্তায়? জনস্বার্থে কি তাঁরা ইমাম হয়েছেন? মুসলমান বলে কোনো কাজের দরজা কি তাঁদের সামনে বন্ধ

করে দেওয়া হয়েছে এই ভারতবর্ষে? সব কাজই তো খোলা আছে তাদের জন্য। তাঁরা চাকুরী করতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন, চাষ করতে পারেন, শিক্ষকতা করতে পারেন, তা হলেই তো তাদের রোজগার থাকে। সেই সব পথ ছেড়ে তাঁরা তো স্বেচ্ছায় ইমাম হয়েছেন। নিশ্চয় তাদের ধর্মের টানে। তা হলে তাদের দায়িত্ব সরকারের উপর কী করে পড়ে? সরকার কি তার মন্ত্রী ও বিধায়কদের মাইনের টাকা থেকে রাজ্যের এই ৩০ হাজার ইমামকে ভাতা দেবে? তা তো দেবে না। দেবে জনগণের পয়সা থেকে। সে অধিকার সরকারকে কে দিল? ক্ষমতার জন্য, গদির লোভে, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমানদের এই সীমাহীন তোষণ করতে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের এইরকম ভাবে নয়ছয় করা—মমতা দেবী মানুষ এটা মেনে নেবে না।

তোষণের সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সিপিএম-ও তাই করেছে। তারা রাজ্যের মুসলমানদের জন্য ১০% চাকুরীতে সংরক্ষণ চালু করে গিয়েছে। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না, তাই আইনের ফাঁক খুঁজে বের করে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মুসলমানকে অতি ও. বি. সি. তালিকাভুক্ত করে ওদেরকে সংরক্ষণ পাইয়ে দিয়েছিল সি.পি.এম। মমতা দেবীও একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছেন কী ভাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে কলা দেখিয়ে মুসলমানদের জন্য সরকারী কোষাগার খুলে দেওয়া যায়। মমতা দেবীর এই নির্লজ্জ সর্বনাশা পদক্ষেপ দেখে সাধারণ হিন্দু, হিন্দু ব্রাহ্মণ, পূজারী পুরোহিতরা ভাবছেন যে তাঁরা কি বানের জলে ভেসে এসেছেন, নাকি তাঁরা সৎমায়ের সন্তান, নাকি তাঁরা এরাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? আর যাদের আর একটু বেশি দূরদৃষ্টি আছে তাঁরা বুঝতে পারছেন এ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান তৈরির পথে আর একটা বড় পদক্ষেপ। আমরা বহুবার বলেছি 'যে অন্ধ সে দেখিতে পাইতেছে না পশ্চিমবঙ্গের আকাশে পাকিস্তানের কালো মেঘ, যে বধির সে শুনিতে পাইতেছে না বাংলার পথে প্রান্তরে পাকিস্তানের পদধ্বনি।' এই সদ্য ১৯/২০/২১ মার্চও টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি কার্টুন প্রকাশকে কেন্দ্র করে হয়ে গেল তার সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী। মিডিয়া চেপে গেল। তাই দূরের মানুষ জানতে পারল না। কিন্তু পার্ক সার্কাস, মল্লিকবাজার, রাজাবাজার, টিকিয়াপাড়া, বসিরহাটের হিন্দুরা দেখল সেই তাণ্ডব। বহু বাস—গাড়ি ভাঙচুর হল, রাস্তা বন্ধ থাকল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষের দুর্দশা চরম হল। মমতার পুলিশ কোথায়? তারা তো সব রকমের সংকেত পেয়ে গিয়েছে যে তাদেরকে কী করতে হবে। মুসলমানের সব অন্যায় অবৈধ কাজকে প্রোটেকশান দিতে হবে, আর হিন্দু পেটাতে হবে।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের এই ইমাম সম্মেলন থেকেও কি এই সংকেত গেল না? সেখানে উপস্থিত পুলিশের বড় বড় অফিসাররা দেখলেন সরকারী পয়সায় আয়োজিত সম্মেলনে শ্লোগান উঠল 'নারায়ে তক্‌বির আল্লাহু আকবর'। তারা শুনলেন আচ্ছালাম আলেকুম, ইনসাল্লা, শোভানাল্লার-র ছড়াছড়ি। এই পুলিশ অফিসাররা কি বুঝে গেলেন না যে থানায় গিয়ে তাঁদেরকে কী করতে হবে? তাইতো ১৪ ফেব্রুয়ারি হিন্দু সংহতির সভায় পুলিশের লাঠি, আর ১৫ই ফেব্রুয়ারি জামাত-ই ইসলামের সভায় দূর থেকে কর্মব্যস্ত মমতার মোবাইলে শুভেচ্ছা ও আশ্বাসবাণী। আজকের প্রজন্মের যুবসমাজ বুঝতে পারবে না, প্রবীণরা বুঝতে পারছেন সাতচল্লিশ পূর্ব সুরাবর্দীর রাজত্ব পুনরায় কায়েম করেছেন মমতা ব্যানার্জী। ঠিক তার পরের পর্যায়ই তো পাকিস্তান। বাংলার হিন্দু, আর একবার প্রস্তুত হও সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়াবার জন্য। মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক

পূর্বসূরীরা আমাদের সুজলা সুফলা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান করেছিলেন। তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মমতা দেবী এবার পশ্চিমবঙ্গকেও পাকিস্তানে পরিণত করে কায়েদ-ই-আজম জিন্নার স্বপ্নকে পুরো করবেন। দক্ষিণ কলকাতাবাসীরা একবার ভাবুন, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের সাংসদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একবার এই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন। আজ সেই এলাকারই সাংসদ ও বিধায়ক মমতা দেবী শ্যামাপ্রসাদের সেই কাজকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার হিন্দুর সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

এর পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের মাদ্রাসা এডুকেশান বোর্ড বহির্ভূত দশ হাজার মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দান করা হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে এই দশ হাজার মাদ্রাসাগুলিতে কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কেমন করে সেই শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কারা সেই শিক্ষা দেবে—তার উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, নজর পর্যন্ত থাকবে না। অথচ এসবের উপর থাকবে সরকারী স্বীকৃতির ছাপ। এর পরিণাম যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা বোঝার ক্ষমতা বর্তমান রাজ্য সরকারের আছে কি? আজ সারা বিশ্বের ত্রাস তালিবানের সৃষ্টি পাকিস্তানের মাদ্রাসা থেকেই হয়েছিল—একথা তারা জানেন কি? মাদ্রাসাগুলিতে সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি ও সমাদরের ভাব এবং সমস্ত ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয় কি? পৃথিবীতে শুধু একটিমাত্র ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অন্য সব ধর্মগুলি মিথ্যা এবং ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত ও ধ্বংসযোগ্য—এই শিক্ষা পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ও শান্তির বাতাবরণ কতটা তৈরি করবে? এইসব কথা চিন্তা না করে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্ত দ্বারা এই রাজ্যকে, এই দেশকে, এমনকি সমগ্র মানবতাকে গভীর সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মমতাদেবীকে আমাদের প্রশ্ন—মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বারা ছাত্রের বা দেশের কোনো উন্নতি হয় কি?

আর একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত মমতাদেবী নিয়েছেন। তা হল, দশ শতাংশ উর্দুভাষী বসবাসকারী জেলাগুলিতে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে উর্দুকে স্বীকৃতি দেওয়া। এও এক আত্মঘাতী ও বিভেদকামী নীতি। এই উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন। উর্দুভাষী পাকিস্তানী শাসকরা সেই ভাষা আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছিল বলেই তার প্রতিবাদে পাকিস্তান ভেঙে জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের। তা হলে এই পশ্চিমবঙ্গে উর্দু ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাভাষা ও ভাষা আন্দোলনের শহীদদের চরম অমর্যাদা করা হল না কি? এই সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক তোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়—খোলা চোখে তাকালেই একথা বোঝা যায়। এতে রাজ্যেরও কোনো কল্যাণ হবে না—মানুষেরও কোনো মঙ্গল হবে না।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার হজ যাত্রীদের জন্য কৈখালিতে ভি. আই. পি. রোডের উপর আটতলা হজমঞ্জিল তৈরি করে দিয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করলেন, রাজারহাটে কুড়িতলা হজমঞ্জিল বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ শুধু মুসলমানদেরকে খুশি করতে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতা। কিন্তু সারা দেশ থেকে আগত গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের জন্য আটতলা, কুড়িতলা তো দূরের কথা, এক ইঞ্চিরও পাকা গাঁথুনি বা স্থায়ী ব্যবস্থা করেনি কোনো সরকারই। তাদের জন্য কলকাতায় ময়দানে ত্রিপলের ছাউনি, আর গঙ্গাসাগরে হোগলা পাতার ছাউনি। আর তার মাঝখানে কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর পৌঁছতে বাসের ভাড়া আড়াইগুণ ও লঞ্চের ভাড়া ছয়গুণ বাড়িয়ে বোকাহাবা হিন্দু তীর্থযাত্রীদেরকে নিংড়ে নেওয়া। কেন্দ্র সরকার হজ যাত্রীদের মাথা পিছু চল্লিশ হাজার টাকা ভর্তুকি তো দিচ্ছেই। ভারতবর্ষে এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষতা।

*সৌজন্যে : হিন্দু সংহতি*

# হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। লাল গেছে, সবুজ এসেছে, কিন্তু হিন্দুর প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মানে যে, সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি ন্যায় আচরণ সে কথা ভুলে গিয়ে আজ দেশের এক শ্রেণীর 'মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী'রা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাজাতেই ব্যস্ত। এই মহাপ্রতাপান্বিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মেনে নিচ্ছে আইনত মুসলমানের বহুবিবাহ। মেনে নিচ্ছে ১৪ ও ১৮ বছর বয়সে যথাক্রমে তাদের শাদির আইন, যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ নির্মাণ। মেনে নিচ্ছে অগণিত মাদ্রাসায় হিন্দু ঘৃণাতত্ত্বের প্রচারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এইসব কবুল করেও এরা প্রগতিশীল, আধুনিক। এর বিরুদ্ধে কথা বলা অপরাধ। স্বাধীনোত্তর উপমহাদেশে তাই আজ হিন্দুর মৃত্যুপরোয়ানা নিয়ে তাণ্ডবরত হিংস্র দানবের দল। পাকিস্তান-বাংলাদেশে আজ হিন্দু হৃতসর্বস্ব, ধর্ষিত, নিশ্চিহ্নের মুখে ও সেক্যুলার ভারতে সংখ্যায়-সংস্কৃতিতে গুণোত্তর প্রগতিতে ক্ষীয়মান। **কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বহুবিধ হিন্দু বিরোধী ক্রিয়াকলাপ—**

❶ **ইমাম ভাতা :** 'আল ফুরকান' হৃদয়ে ধারণ করে যারা 'দ্বীন'-এর নামে 'ওরা আমরা'-র ফারাক গড়তে আত্মোৎসর্গীকৃত, সেই ইমামদেরকে ঘুষ মাসে ২৫০০ টাকা। এ যেন তেলা মাথায় তেল! মুসলমানরা তাদের রোজগারের ১৫ শতাংশ সুসংগঠিতভাবে ইসলামীয় যাজকতন্ত্রের মাধ্যমে 'উম্মা'র বিস্তার ও শত্রুহননে ব্যয় করে। আরব দুনিয়া থেকেও 'দ্বীন-ইসলাম'-এর ও 'বেরাদরি'-র কল্যাণে হিসেবছাড়া পেট্রোডলার অগণিত NGO-র মাধ্যমে ভারতে খাটছে। দেশের বেশির ভাগ মিডিয়া পরোক্ষভাবে হয় খৃষ্টান, নয় মুসলমানের মালিকানাধীন। নেহাৎ টাকার জোরে যারা ভারতের মত দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিকে পকেটে পুরে রাখতে পারে, তাদেরকে এই বিশ্রী উৎকোচ দেওয়াকে রসিকতা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। 'ইমাম'দের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য বিশ্বময় 'ইসলামী উম্মা' প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। 'তাওরাত' (Old Testament) অনুসরণ করে যারা যথেচ্ছ সংখ্যাবৃদ্ধি করে নতুন নতুন ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে সংখ্যালঘু/রাজনৈতিক হীনবল করে দিয়ে, জিহাদে পরাস্ত করে—তাদের দেশ দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাদের স্বভাব পরিবর্তনের জন্য এ ওষুধে কাজ হয় না। সমৃদ্ধ মুসলমানের অর্থ 'জাকাত' হিসাবে পুনরায় 'কাফের' নিধনেই ব্যয়ীকৃত হয়, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে গড়া যাবতীয় জ্ঞানসৌধ ব্যবহৃত হয় 'কাফের'-এর চরম সর্বনাশের নিমিত্ত, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস।

❷ **উর্দুর স্বীকৃতি :** রাজ্য সরকার কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত এক বিলে [The West Bengal Official Language (Ammendment) Bill 2012] বলা হয়েছে যে, যে সকল জেলা, ব্লক বা মহকুমায় উর্দুভাষীর সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি, সেখানে উর্দুকে সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনার নিশ্চিত এ কথা অজানা নেই যে বাংলার মুসলমানের মধ্যে 'বঙ্গভাষী'ই ব্যাপকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অ-বঙ্গভাষীদের মধ্যেও

হিন্দি-বোলিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ, উর্দু-জান্তা হাতে গোনা। সুতরাং উর্দুর এই আস্কারায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আম-মুসলিমের আদৌ উপকৃত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাহলে কেন এই বিসদৃশ তৎপরতা? আসলে ইসলামী ভোটের স্বাদ পেয়ে আপনি হিংস্র বাঘিনীর মতো হয়ে উঠেছেন। ইসলামী চেতনার বিষবৃক্ষের মূলে প্রতিটি অঞ্জলি জলসিঞ্চনের প্রতিক্রিয়া কেমন বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো হয় তা আপনি ও আপনার চূড়ান্ত অপরিণামদর্শী দলবল বুঝে ফেলেছেন।

❸ **ধর্মীয় ভিত্তিতে ছাত্রবৃত্তি, চাকরি, ব্যবসা ঋণ :** অগণিত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের দেশ এই ভারতেও উন্নত জীবন-জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে খৃষ্টান-মুসলমানেরা সুয়োরানী। খৃষ্টানরা তো ৯৯ শতাংশই ভাষায়-সংস্কৃতিতে পশ্চিমমুখী ও সেই সুবাদে রাজকীয় বৃত্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী, আর মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু হওয়ার লক্ষ্যে অজস্র সন্তান উৎপাদন ও পালন করতে গিয়ে জ্ঞান-অনুশীলনে যেটুকু পিছিয়ে পড়ছে, সেই ঘাটতিটুকু পূরণ করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন ভারত সরকার। গত ২২ ডিসেম্বর সরকারী ঘোষণা অনুসারে অনগ্রসর শ্রেণীর ২৭% কোটা থেকে ৪.৫% কেটে মুসলমানদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৌলানা আজাদ ফাউন্ডেশনকে দেওয়া ৭০০ কোটি টাকা থেকে ৭২ লক্ষ ৯ হাজার মুসলিম ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। হিন্দু ছাত্রেরা যেখানে শিক্ষা ঋণের সুদ দিচ্ছে ১৩% হারে, সেখানে মুসলমানেরা সেই সুদ দিচ্ছে ৩% হারে। ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দুদেরকে অনুমোদিত ঋণের ৪০% মার্জিন হিসাবে জমা রাখতে হয়। ঋণের সুদের হার বার্ষিক ১৩%। মুসলমানের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মার্জিন মাত্র ১৫% এবং ঋণের সুদের হার মাত্র ৬%।

❹ **সাম্প্রদায়িক ও লক্ষিত হিংসা বিল :** সনিয়া মাইনোর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদের প্রস্তাবিত এই বিল অনুসারে দেশের জনসাধারণকে দুটি দলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। একটি দলে মুসলমান খৃষ্টান ও অন্য দলে হিন্দু। হিন্দু এখানে অবিসংবাদিত ভিলেন। দেশে যদি কোথাও কোনও দাঙ্গা হয়, তবে তার জন্য প্রথমতঃ দায়ী হিন্দুরাই বলে ধরে নেওয়া হবে। অপর দলটির কোনও ব্যক্তির যদি মনে হয় যে হিন্দুরা এমন কিছু করছে যা তার পক্ষে হানিকারক, তবে তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে যতদিন ইচ্ছে জেলে আটকে রাখতে পারবে। বাড়ি ভাড়া, কেনা-বেচা, ব্যবসা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ করা যাবে। কোনও পুলিশ আধিকারিক এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শৈথিল্য দেখালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। কোনও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে শিথিল হলে কেন্দ্র সরকার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে সেই সরকারকে ভেঙে দিতে পারবে। এই বিল বাস্তবায়িত হলে হিন্দুরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে ও হিন্দুরা নিজ দেশে পরবাসী হবে।

*উপরোক্ত সরকারী পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিন্দুরা তাদের বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্রগুলির বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার কারণে ও সংগঠিত না হওয়ার কারণে সংখ্যার দিক দিয়ে গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত, অপমানিত হচ্ছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশ ও বিদেশে বসবাসকারী সকল হিন্দুকে উক্ত বিষয়গুলিতে সচেতন হতে ও বিশ্বময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানাচ্ছে।*

*সৌজন্যে : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ*

# আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজ

কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী

আলিয়া নাম-বিতর্ক সামলাতে কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ'কে বিশ্ববিদ্যালয় করার সুপারিশের পরে এ বার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্যের সংখ্যলঘু উন্নয়ন দফতর। প্রকল্পটির বিশদ রিপোর্টও (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে।

মহাকরণের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর সূত্রের খবর : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে রাজারহাটে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য যে কুড়ি একর জমি বরাদ্দ করেছে, তারই দশ একর জুড়ে পাঁচশো শয্যার হাসপাতালটি তৈরি হবে। প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটিতে দু'শো পড়ুয়ার আসন থাকবে। ডিপিআর অনুযায়ী, পুরো প্রকল্পটি রূপায়িত করতে খরচ হবে ৫০১ কোটি টাকা।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক, সেখানকার সব পড়ুয়ারই আরবি ও ইসলামি ইতিহাস পড়া বাধ্যতামূলক। মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে বলে সংখ্যালঘু দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন।

আলিয়ার উপাচার্য শামসুল আলম বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু কাজ এগিয়েছে বলে জেনেছি।" মহাকরণ সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায়। তিনিই সংখ্যালঘু দফতরেরও মন্ত্রী। চলতি অর্থবর্ষে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৯৮ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।

এবং মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়পত্র পেলে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়ে যেতে পারে বলে দফতর-সূত্রের ইঙ্গিত। এক কর্তার কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি বানাবে। মেডিক্যাল কলেজের বিল্ডিং নির্মাণের দায়িত্ব কে পাবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।" তবে চলতি অর্থবর্ষেই মেডিক্যাল কলেজ ভবন তৈরির কাজ শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এ দিকে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ এখন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। হঠাৎ একটা মেডিক্যাল কলেজ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে কেন? সরকারি এক কর্তার ব্যাখ্যা, "মুখ্যমন্ত্রী যদি চান, তা হলে এমনটা হতেই পারে।" তাঁর মতে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজ হলে সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি পরার সুযোগ বেশি পাবেন। কিন্তু মেডিক্যালে তো ছাত্রভর্তি হয় জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার মাধ্যমে। তা হলে ওই মেডিক্যাল কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রী বেশি পড়বেন, এমনটা বলা যাচ্ছে কী করে? যেখানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সব জাতি ও ধর্মের পড়ুয়াদের জন্য উন্মুক্ত?

আলিয়ার উপাচার্য বলছেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বলা রয়েছে, প্রত্যেক পড়ুয়ার আরবি ভাষাশিক্ষা আবশ্যিক। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে, তাই এখানে ইসলামি ইতিহাস পড়াও বাধ্যতামূলক।" এই নিয়মে মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা বেশি সংখ্যায় আসতে চাইবেন বলে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের ধারণা। ***সৌজন্যে :*** *আনন্দবাজার, ২৫.৪.১২*

# ইমামদের ইনাম (ভাতা) প্রসঙ্গে

*"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাজনৈতিক কৌশল বহু পরিচিত, বহু নিন্দিত, ভ্রান্ত এবং বিপদজনক" (০৫.০৪.২০১২ তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়)*

গত ৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক আমাদের নবীনতম মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ৩০ হাজার (আপাতত) ইমামদের মাসিক ২,৫০০ টাকা সাম্মানিক ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করা' প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য। মা-মাটি-মানুষ তত্ত্বের সমর্থক হিসেবে এই মন্তব্যে আমরা দুঃখ পেয়েছি। তবে ঐতিহাসিক সত্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বিবেকের তাড়নায় ২/৪টি কথা বলব। প্রথম কথা, মসজিদের ইমাম সাহেবদের বাঙালির জন্য এমন কী অবদান আছে যার জন্য এই ভাতা? তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ক'জন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন? আন্দামান সেলুলার জেলে রক্ষিত রেকর্ড দেখলে তার হদিশ পাওয়া যাবে। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলার ক'জন মুসলমান ভোটার অখণ্ড ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন? সেদিন জাতীয়তাবাদী সব মুসলমান প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। 'হয় পাকিস্তান আদায় করে নেব, নয়ত ভারতকে ধ্বংস করে দেব'—মুসলিম লীগের সর্বেসর্বা মি. এম. এ. জিন্নাহ্‌র এই দাম্ভিক তথা নোংরা উক্তির আগেই ড. আম্বেদকর অনৈতিক মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছিলেন 'তোষণের কোনও সীমা রেখা নেই।' এই তত্ত্ব যে অত্যন্ত সঠিক ইতিমধ্যে প্রমাণ দিলেন জমিয়তে উলেমা হিন্দের সভাপতি সিদ্দিকুল্লাহ্‌ চৌধুরী। তিনি রাজ্যের তিন কোটি সংখ্যালঘুর জন্যই চাকুরির দাবি জানিয়েছেন। (আনন্দবাজার- ২০.৪.২০১২)

আজ আমরা বিনীতভাবে মা-মাটি-মানুষের সরকারকে বাবাসাহেবের ওই হুঁশিয়ারির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এরই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ৭১২ খ্রি. থেকে বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা যে কোরান নিয়ে ভারতে এসেছিলেন, বর্তমান ইমাম সাহেবদের হাতে সেই একই কোরান আছে। কোরানে বর্ণিত বিধান অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইমাম ও মুসলিম ধর্মগুরুরা জেহাদের ডাক দিলেই বাংলার ইমাম ও অন্যান্য মুসলমানরা কি ঝাঁপিয়ে পড়বেন না? কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব সম্ভবত মমতাদির কাছে সবচেয়ে সম্মাণীয়। এই কয়েক বছর আগে এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আপনারা হিন্দুরা আমাদের উপর 'ইনজাস্টিস' করছেন। এটা চলতে থাকলে আমরা জেহাদের ডাক দেবো। জেহাদ আমাদের ধর্মের অঙ্গ। কেউ আটকাতে পারবেন না। মমতাদিদি এবং তার পরামর্শদাতারা কি জানেন, জেহাদ কাকে বলে? জেহাদ হচ্ছে একটি চেষ্টা বা কঠোর চেষ্টা। নবী মহম্মদের ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের বিরুদ্ধে (ইসলামী মতে) ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করা। এটি কোরান নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। দেখুন 'দি ডিকশ্‌নারী অব ইসলাম' টি. পি. হিউজ, পৃ.২৪৩। হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে কি করছে না সে বিচার করবেন বরকতি সাহেব নিজে। বিচারে হিন্দুরা দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি জেহাদের ডাক দেবেন। এই জেহাদের প্রথম সারির সৈনিক থাকবেন ইমাম সাহেবরা।

কোরান-ভিত্তিক আরবীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক ভারতে বসবাসরত ইমাম সাহেবদের প্রধান কাজ মসজিদে মসজিদে নামাজ পরিচালনা করা, নামাজের পরে ইসলাম এবং নবীজীর গুণগান করা এবং তার সঙ্গে জেহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এর বাইরে সকলের হিতার্থে কোন

উৎপাদনশীল কাজে তারা অংশগ্রহণ করেন বলে আমাদের জানা নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আমাদের এই বক্তব্য সম্পর্কে তাদের মতামত আশা করছি।

সমগ্র বাংলায় ইমামদের সংখ্যা কি মাত্র ৩০ হাজার? পাঁচটি মুসলিম পরিবার একত্রিত হয়েও একটি মসজিদ নির্মাণ করা যায়। সেখানে কম করেও একজন ইমাম থাকবেন। মুসলিম বিধান অনুসারে ওই ইমাম সাহেবের যাবতীয় খরচ বহন করবেন স্থানীয় মানুষেরা; এমনকি তার পরিবার পরিজনদেরও। ইমাম সাহেবরা কোনও সরকারী সাহায্য নিতে পারবেন না। রাজ্যে অন্তত ৬৭ হাজার মসজিদ আছে। এর কোনটায় একজন এবং কোনটায় দু'জন ইমাম আছেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবদের আর একটি প্রধান কাজ হচ্ছে অন্যান্য মুসলমানদের বোঝানো যে, হিন্দু এবং মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি। ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং হিন্দুধর্ম নিকৃষ্ট ধর্ম। কোরানের ৫/৪৪নং বিধান অনুসারে হিন্দুরা কাফের। মৃত্যুর পরে এই হিন্দু এবং অন্যান্য বিধর্মীরা অবশ্যই ইসলামী নরকে যাবে। এবং যে কোনও মুসলমান, এমন কি সবচেয়ে পাপী মুসলমানটিও শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যাবে। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, কলকাতার অন্তত ১০ জন ইমাম এগিয়ে এসে প্রমাণ করুন যে, আমাদের বক্তব্য ভুল। আমাদের রাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক সাধারণ মুসলমান শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে আছেন। নিরপেক্ষভাবে খোঁজ করলে দেখা যাবে মসজিদের ইমাম সাহেবরা এবং মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক নবী মহম্মদ এবং সম্রাট আকবরের উপমা টেনে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে কোনও শিক্ষার প্রয়োজন নেই। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে শ্রমিক শ্রেণির মুসলমানের দারিদ্র দূর করতে পারবে না কেউ।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পৌনে তিন কোটি মুসলমানদের মধ্যে কোটিপতি ও লক্ষপতির সংখ্যা নেহাত কম নয়; তেমনি দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত সাধারণ মুসলমানের সংখ্যাও অনেক। তারা অনেকেই ইমাম সাহেবদের তথাকথিত ফতোয়াকে উপেক্ষা করে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত আছেন। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবদের তুলনায় তাদের অবদান অনেক বেশি। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় দারিদ্র তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জানা মতে ইমাম সাহেবরা পরিবার পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। তাদের বক্তব্য, ভারতে হিন্দুরা 'ইনজাষ্টিস' করে বলেই মুসলমানরা দিন দিন গরীব হচ্ছে। অথচ পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের ইমামরা বলেন—জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য এবং সম্পদ দেবার মালিক আল্লাহ্। এ ব্যাপারে মুসলমানের গরীবদের উদ্দেশ্যে 'জাকাত' দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার নেই। অধুনা ভাতা-পাওয়া ইমাম সাহেবরা এখন থেকে এ কথা আরও বড় গলায় প্রচার করার লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। ইউনিফরম সিভিল-কোডের কথা মুখেও আনবেন না। হয়ত বা চিরদিনের জন্য মাটি চাপা পড়েই যাবে।

বর্তমান রাজ্য সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে অর্থনৈতিক বিচারে যথার্থ গরীবদের ঘর-বাড়ি করে দিতে পারেন, যতখুশি স্টাইপেন্ড দিতে পারেন। সাইকেল কিনে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনা ক্ষমাহীন পাপের কাজ বলে আমরা মনে করি। হরিবর সাহা, রামপদ চক্রবর্তী আর জব্বার মণ্ডলকে আলাদা চোখে দেখা যাবে না। এখানে আর একটি জরুরি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা প্রয়োজন ১৯৪৬-এর নির্বাচনে দুই বাংলার শতকরা ১০০ জন হিন্দু অখণ্ড ভারতের

পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাদের কোনও প্রকার মতামত না নিয়ে মূলত কংগ্রেস মুসলিম লীগের হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ করে দেশ ভাগ করতে বাধ্য হলেন। ড. আম্বেদকর এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর 'সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব' ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ওপার বাংলার ২ কোটি হিন্দু ধর্মান্তকরণের জন্য দিন গুনছেন। এপারে প্রায় তিন কোটি হিন্দু বেনাগরিক অবস্থায় ভিখিরির জীবনযাপন করছেন। শুধু মমতা ব্যানার্জী নন, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতা এর সব কিছু জানেন! সর্বশেষে ঠাকুরনগরের বড়মা মমতাদির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু মমতাদি নীরব নিথর হয়ে সময় কাটাচ্ছেন। মমতাদি কি অনুগ্রহ করে জানাবেন পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতে নাগরিকত্ব না দেবার কি কি কারণ আছে? আপনি জেনে নিন, এরা দীর্ঘদিন নীরব থাকবেন না। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী হিন্দু উদ্বাস্তুরা ভিখিরির জীবনযাপন করবে, আর কাফের নিধন তত্ত্বে বিশ্বাসীরা মাসিক ভাতা পাবে, তা হতে পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তর ২৪ পরগনা জিলার দেগঙ্গার অদূরে কেউকেপাড়া থেকে 'বঙ্গনূর' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করেন জনাব আবদুর মতিন। ১৪১৭ সনের আশ্বিন মাসের (১৪-৩১) সংখ্যায় ভারতের সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতকে আবার স্বাধীন করার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই পত্রিকাটি কেবলমাত্র মসজিদ ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়। এখানে ইমাম সাহেবদের কাছে আমাদের প্রশ্ন—ঐ বক্তব্যের সঙ্গে আপনারা কতটা দ্বিমত পোষণ করেন? ২০১০-এর ৭,৮,৯ সেপ্টেম্বর, এই তিনদিন ধরে দে-গঙ্গা বাজার থেকে বেলিয়াঘাটা পর্যন্ত লুঠপাট-অগ্নিসংযোগ এবং সরকারী গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। দে-গঙ্গা, বারাসাত এবং কলকাতা থেকে ক'জন ইমাম সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন? আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ২/৪ জন ইমাম বলেছেন, আমাদের কাজ ধর্মপ্রচার করা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঠেকানো আমাদের কাজ নয়। খুবই সঠিক কথা। কিন্তু মমতাদি কোত্থেকে খবর পেলেন কোথায় এবং কবে নাকি ইমাম সাহেবরা দাঙ্গা রুখে দিয়েছিলেন। কারা সেদিন দাঙ্গা করতে গিয়েছিলেন, দিদি? আর কোন মুখেই বা আপনি একথা বললেন? আপনিই তো আমাদের রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী। দাঙ্গা-হাঙ্গামা রুখে দেওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার। বাইরে থেকে আমরা সবাই আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু সেদিন কেবল ইমাম সাহেবরা দাঙ্গা রুখে দিয়েছেন, এ তথ্য আপনাকে কে দিয়েছে? পূর্ব এবং পশ্চিমবাঙলার বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে কি? এখানে প্রশ্ন ওঠে, যারা দাঙ্গা রুখে দিতে পারেন তারা অনেক সহজে দাঙ্গা বাঁধাতেও পারেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ ভাগ ইমাম সাহেবরা রাজাকারের ভূমিকা পালন করেছে। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এরাজ্যে যদি তেমন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি কি স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি ইমাম সাহেবদের হাতে তুলে দেবেন?

পরিশেষে আর একটি কথা বলব, যে কোন কারণেই হোক আজকের ভারতে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অলিখিত এবং অঘোষিত আইন চালু হয়ে গেছে। বাঙলার আকাশে বাতাসে আজ এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে, অনুৎপাদনশীল কাজ তথা ইসলাম ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ইমাম সাহেবদের মাসিক ভাতা দেবার সহজ অর্থ টাকা দিয়ে ভোট কেনা। ভোট কেনার প্রয়োজন এবং দায়দায়িত্ব থাকতে পারে একটি রাজনৈতিক দলের। কোন গণতান্ত্রিক সরকারের নয়। তাই বর্তমান মা-মাটি-মানুষের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক অনুৎপাদনশীল কাজে

এক টাকাও খরচ করুক, আমরা তা চাই না। তেমনি সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত সিলেবাস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত একটি মাদ্রাসাকেও স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হবে ভারতকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া। বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতি তথা ভারতের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে আগ্রহী অসাম্প্রদায়িক এবং গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের কাছে আমরা এই নিবেদন রাখছি। আপনারা এটি পড়ুন। মতামত দিন এবং ভালো লাগলে প্রশাসনের সর্বস্তরে একটি করে কপি পৌঁছে দিন।

অন্যতম মহা পুণ্যের কাজ ঈদের নামাজের পরে মুসলিম দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র কাছে যে ভাষায় প্রার্থনা করা হয়—"হে আল্লাহ্‌, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্‌! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন,...হে আল্লাহ্‌! আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন,...হে আল্লাহ্‌! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা—বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ...হে আল্লাহ্‌! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।" (দেখুন : 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ-১৪০৭, পৃ-১৬০)

ইমাম সাহেবদের মাসিক কত টাকা ভাতা বাড়লে প্রার্থনার এই ভাষা পরিবর্তন করা যাবে? আর এই ভাষা না পালটালেও কি তাদের ভাতা দিয়ে যেতে হবে?

## ২৫০০ টাকায় কি হয়!

# একটা ভোট এলে ভাতাটা দশ না হলেও পাঁচ হাজার তো হবেই

সাধন কুমার পাল

কেউ বলছেন মমতা নুন খাইয়ে দিয়েছে এখন ইমামরা গুণ গাইতে থাকবে। কেউ বলছেন মমতা ক্ষমতায় এসেই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে নিজের ও দলের ভবিষ্যৎ গড়তে সরকারি কোষাগার থেকে ইমামদের সহায়তার নামে বড় একটি বিনিয়োগ করে রাখলেন। কারণ এখন 'কৃতজ্ঞ' ইমামরাই মমতার জেতার জন্য মুসলমান ভোটের জিম্মা নিয়ে নেবেন। আবার কেউ বলছেন বহুধর্মের দেশে ইমামদের বেতন দিয়ে শুধুমাত্র ইসলামের প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গে মমতা একটি বিষবৃক্ষ বপন করে দিলেন। আর ইমামরা কানাঘুষো করছেন 'মমতার মতো রাজনীতিকদের প্রাণভোমরা আমাদের হাতে। ফলে ভোট ছাড়াই আড়াই হাজার আর ভোট এলে এটা পাঁচ বা দশ হাজার হতে কতক্ষণ!'

হ্যাঁ, গত ৩ এপ্রিল মঙ্গলবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম বিভাগ আয়োজিত মসজিদের ইমামদের সম্মেলন নিয়ে আমজনতার তরফে এরকমই প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে সরকারি উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এরকম ধর্মসম্মেলন আয়োজনের নজির হিসেবে এটিই বোধহয় প্রথম। এই সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইমামদের জন্য ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে মাসিক ২৫০০ টাকা, গৃহহীন ইমামদের বাড়ি তৈরির জন্য তিনকাঠা করে জমি

এবং অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। শহরাঞ্চালের ক্ষেত্রে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে এবং জেলার ক্ষেত্রে জেলা শাসকদের ইমামদের বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজন মতো জমির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও ঘোষণা করা হয়েছে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হবে একটি টাস্কফোর্স। এই কমিটিতে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন ইমাম ছাড়াও থাকবেন ওয়াকফ কমিটির চেয়ারম্যান মহঃ আব্দুল গণি।

ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও বিশেষ ধর্মের ধর্মযাজকদের শুধুমাত্র তার নিজস্ব ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা যায় কিনা একমাত্র 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপি ছাড়া মমতার এই পদক্ষেপের ঔচিত্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেমন কেউ প্রশ্ন তোলেনি। মুসলমান ছাড়া অন্য উপাসনা পদ্ধতির ধর্মযাজকদের সরকারি দাক্ষিণ্য থেকে ব্রাত্য করে রাখার এই প্রবণতা যে ভারতের মতো বহু মত ও পথের মানুষের দেশে এক বিপজ্জনক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চলেছে এ প্রশ্ন কিন্তু কেউ তোলেনি। সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রহারের সামনে, সংখ্যালঘু বা অতি পিছিয়ে পড়া জাতীয় শব্দবন্ধগুলিকে শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করে, শুধুমাত্র মুসলমানদের দারিদ্র্য অনুন্নয়ন নিয়ে নানা পরিসংখ্যান তুলে ধরে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থেকে শুরু করে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা ভোগী ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতা রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে যে সেই ১৯৪৭-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছে এ প্রশ্নও কিন্তু কেউ তুলছে না। অবশ্য বলা ভালো এই প্রশ্ন তোলার সাহস এখন কারো নেই। কারণ রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে আর তথাকথিত বিদ্বজনরা ধর্মনিরপেক্ষ তকমা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো পেট্রোডলারের দাক্ষিণ্য হারানোর ভয়ে কাতর। বর্তমান ভারতে এই দুর্বলতা, এই ভয়, এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেশকে এমন এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা ভাবতে ভয় হয়।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'জোর যার মুলুক তার' নামক জঙ্গলের নীতিটিই হচ্ছে এখন ভারতীয় রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ভোটের ময়দানে তুলনায় বেশি শক্তিশালী দেশের সরকারটি যেন তাদেরই। সরকারি সুযোগ সুবিধের নিরিখে আমজনতা ও অন্য সম্প্রদায় গোষ্ঠীর অবস্থানটি যেন অনেকটা উচ্ছিষ্ঠ ভোগী বা কৃপা প্রার্থীর মতো। ফলে এদেশে শুধু ধনী ও গরীবদের মধ্যেই নয়, বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে হিন্দু দরিদ্র ও মুসলমান দরিদ্রের মধ্যেও।

সংখ্যালঘু হয়েও এদেশের মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ ওদের সিংহভাগই রাজনৈতিক ভাবে মুসলমান স্বার্থ নিয়ে দরাদরি করে সংগঠিত হয়ে ভোট দেয়। যে দল বেশি সুযোগ-সুবিধের আশ্বাস দেয় সেই ভোট তাদের দিকে যায়। বছরের পর বছর ধরে এই সাম্প্রদায়িক ভোটের রাজনীতি চলে আসার ফলে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও পাল্টে যেতে শুরু করেছে। ফলে এদেশে সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ ক্ষুধা দারিদ্র্য বেকারির জ্বালায় জর্জরিত হলেও শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য সাচার কমিটি বা রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির মতো কমিটি গঠন, এই সমস্ত কমিটির সুপারিশ মতো ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থেকে শুরু করে নানা সুযোগ সুবিধা ও প্রতিশ্রুতি প্রদানও ধর্মনিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।

**মোট কথা মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব ও রাজনীতিকদের ক্ষমতার লোভ এখন এদেশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মুসলমান তোষণ আর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটো যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তোষণ নীতির ফলে মুসলমান সমাজ কতটা এগোচ্ছে তা বিচার সাপেক্ষ হলেও মমতা-মুলায়মের মতো রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র স্বার্থে যে ওদের দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হতে দিচ্ছে না এটা স্পষ্ট।** বৃটিশ ভারতে এ দেশের মুসলমান সমাজের এই রাজনৈতিক দরাদরির ক্ষমতা গান্ধী-নেহরুর মতো তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মুসলমান তোষণ নীতির মতো। এর চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামের দেশ দুটি। এই তোষণ প্রবণতা চলতে থাকলে খণ্ডিত ভারত যে আবার খণ্ডিত হবে না এমন গ্যারান্টি বোধহয় দেওয়া যায় না। কারণ এখন একদিকে সংখ্যালঘুরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ে সংহত হচ্ছে, অন্য দিকে সংখ্যালঘুরা আত্মপরিচয়ের নামে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরের মতো দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক কলহে ব্যস্ত।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য গত ৯ এপ্রিল 'মমতা সরকার' ২২০/এস এম এ এম এই/১২ এই মেমো নম্বরে জারি করা এক নির্দেশিকায় বলেছে ইমামরা মুসলিম সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালান বলেই নাকি এই ইমাম ভাতার আয়োজন। মমতার ইমামভাতার ঘোষণাকে বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্য ১৯৯৩ সালে ইমামদের বেতন নিয়ে সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের দায়ের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হতে পারে। এই বিভ্রান্তি চরমে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমনও বলা হতে পারে যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি কোষাগার থেকে হিন্দু পুরোহিতদের মাসিক বেতন দেওয়া দোষের না হলে ইমামদের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন উঠছে কেন?

ইতিহাস বলছে ধনসম্পদের লোভে সোমনাথ মন্দির বহুবার লুণ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ আমলে আইনের মাধ্যমে হিন্দু মন্দির অধিগ্রহণ করে সেই লুণ্ঠনের ধারা অব্যাহত ছিল। স্বাধীন ভারতে সেই একই উদ্দেশ্যে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ একমাত্র হিন্দুদের মন্দির 'অধিগ্রহণের জন্য' তৈরি হলো হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ড চ্যারিটেবল এনডাউমেন্ট অ্যাক্ট-১৯৫১। মন্দিরের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ও পুরোহিতদের মাইনে দিতে সামান্য অংশ খরচ হলেও এই সমস্ত মন্দিরের বিপুল আয়ের বেশির ভাগটাই খরচ হয় মুসলমান-খৃস্টান ধর্মের উন্নয়নসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে। এটি ব্যতিক্রম এই জন্যই যে একমাত্র মন্দির ছাড়া মসজিদ বা গির্জার আয় থেকে একটি পয়সাও এদেশে সরকারি কোষাগারে ঢোকে না। যেমন তিরুপতি মন্দিরের বার্ষিক আয় গড়ে তিন হাজার পাঁচশো কোটি টাকা। এর ছিটেফোঁটা অর্থাৎ ১৫ শতাংশ মন্দিরের উন্নয়ন ও পুরোহিতদের বেতনের জন্য রেখে আর বাকি তিন হাজার কোটি টাকা অন্ধ্রপ্রদেশের সাধারণ বাজেটে ঢুকে যায়। অথচ এই অন্ধ্রপ্রদেশের হাজার হাজার মন্দির অর্থাভাবে ধুঁকছে, সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়ছে, হিন্দু পুরোহিতরা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনও রকমে টিকে আছে। এই প্রসঙ্গে কর্ণাটক সরকারের দেওয়া ১৯৯৭-২০০২ সালের মন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসেবে চোখ রাখলে সংখ্যাগুরুরা যে এদেশে ধর্মীয় দিক থেকে কীভাবে শোষিত হচ্ছে তা স্পষ্ট হবে। যে বাংলার ইমামদের জন্য মমতা মাসিক ভাতার আয়োজন করলেন সেই বাংলায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা কেমন আছে তা দেখতে সমাজের দর্পণ সাহিত্যের পাতায় চোখ রাখা যেতে পারে। যেমন তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী'

গল্পে লিখেছেন, '...চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্রের শতমুখি আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই—দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যিই হৈমবতী।' গল্পের আরেকটি জায়গায় এই ব্রাহ্মণ ঘরণী হৈমবতী ওঁর স্বামীকে বলছেন, 'বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবুও মরে না ওরা!...'

'পথের পাঁচালী'তে অপুর পিতা ব্রাহ্মণ হরিহরের আর্থিক দৈন্যতা বোঝানোর জন্য বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।' বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে পুরোহিতদের আর্থিক দৈন্যের এরকম হাজারো হৃদয়বিদারক দৃশ্য। সময় বদলেছে, সমাজ পাল্টেছে, বড় বড় প্যান্ডেলে পুজো হচ্ছে, পঁয়ষট্টি বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু পুরোহিতদের আর্থিক দৈন্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

অর্থাভাবে এরাজ্যের টোলগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টোলের পণ্ডিতরা না খেয়ে মরছে। মমতা এ রাজ্যে দশ হাজার মাদ্রাসা নিয়ে উৎসাহ দেখালেও টোলের কথা একটি বারের জন্যও মুখে আনছেন না। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের কর্ণধার হিসেবে মমতার এই একপেশে আচরণ সাম্প্রদায়িক হিংসা দ্বেষ ছাড়া কোনভাবেই সমাজে সুস্থ বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে না। গত ৩৪ বছরে দলীয় সংগঠন দিয়ে বামেরা এ রাজ্যের বারোটা বাজিয়েছে। এখন মমতা সরাসরি সরকারি ক্ষমতা দিয়ে সেই কাজটি করছে। কে যেন বলে ছিল, আমরা হার্মাদ তাড়িয়ে উন্মাদ এনেছি! এখন মনে হচ্ছে কথাটি বোধহয় ঠিকই বলেছে।

# ইমামদের বেতন সর্বনাশের শুরু

## নটরাজ ভারতী

সর্বনাশের শুরু। শুধু মুখটা দেখা গেছে। তাতেই আঁতকে উঠছি। এখনও অনেক বাকি। শেষ কোথায়। কারও জানা নেই। সরকারি পয়সায় ইমামদের সম্মেলন। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এটা হয়। পণ্ডিত পুরোহিত সম্মেলন কষ্টকল্পনা। ইমামদের মাস-মাইনে দেওয়া হবে। এমন ভাব যেন এ রাজ্যে ইমামরাই একমাত্র গরীব। আর গরীব নেই। তাই ইমামদের মাস-মাইনের ব্যবস্থা। ইমামদের একমাত্র কাজ ইসলাম ধর্মের প্রচার। হিন্দু ভারতকে মুসলিম ভারতে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চালানো। সরকার সেই কাজের জন্য টাকা দেবে। জনগণের টাকায় মৌলবাদকে প্রশ্রয়। এরপরও আমরা চুপ থাকবো। বসে বসে নিজেদের সর্বনাশ দেখবো।

ইমামরা কখনও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলে না। সব ধর্ম সমান এমন কথাও বলে না। ধর্মনিরপেক্ষতা নামক দুর্গন্ধের কথাও বলে না। তারা তাদের লক্ষ্যে স্থির অবিচল। কাফের রাষ্ট্র ভারত। মানে শত্রু রাষ্ট্র। এটা ইসলামের রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। কোথাও কখনও শোনা যায়নি ইমামরা সেবাপরায়ণ। কোথাও কখনও দেখা যায়নি ইমামরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনাচ্ছেন। দেশ অথবা সমাজ গঠনেও ইমামদের কোনও ভূমিকা নেই। তারা প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিনিয়ত মনে করান—তুমি আগে মুসলমান পরে অন্য কিছু। বরং মুসলিম সমাজকে এগোতে

দেয় না ইমামরা। আধুনিক শিক্ষার চরম বিরোধী এই ইমামদের জন্যই বেতনের ব্যবস্থা।

মুসলমানদের উন্নতি করা মমতার লক্ষ্য নয়। এ আগুন নিয়ে খেলা নয়। রীতিমতো গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে খেলা। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আশঙ্কায় দিন গোণা। সবাই বুঝছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কথায় কথায় মোমবাতি নিয়ে ধর্মতলায় ধর্না দেওয়া প্রাণীকুল নীরব। চরম এবং চূড়ান্ত অন্যায়। দেশের সর্বনাশ। রাজ্যের সর্বনাশ। সব থেকে সর্বনাশ মুসলমানদের। এসব জেনেও সব চুপচাপ। শিক্ষিত-অতিশিক্ষিত দিদির তল্পিবাহকেরা নীরব।

সরকারি টাকায় ইমাম সম্মেলন। অন্যায়, ইমামদের বেতন দেওয়া অন্যায়। সরকারি টাকায় ভোটের প্রভাব। অন্যায়। এত অন্যায়। এক সঙ্গে। কলকাতায় প্রচুর বুদ্ধিজীবী। কেউ সুশীল। কেউ প্রগতিশীল। এই সব 'শীল' যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সব বুদ্ধিকে দিদি শিল চাপা দিয়েছেন। কেউ আর মাথা তুলতে পারছে না। বয়োবৃদ্ধ ঢোঁড়া সাপের মতো। নড়নচড়ন নেই। পুকুরপাড়ে রোদে কাত মেরে পড়ে থাকে।

ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি চলবে না। সভায় সভায় তর্কের ফোয়ারা। একসময় ছিল। এখন আর নেই। এখন সবাই বুঝেছেন ধর্মছাড়া রাজনীতি হয় না। তাই প্রকাশ্যে মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে দিদি পার পেয়ে যাচ্ছেন। কেউ প্রশ্ন তুলছেন না—অহেতুক শুধু মুসলিম ধর্মের বাহকদের এই সুবিধা কেন? সব মাথা বন্ধক আছে দিদির কাছে। কলকাতার সব বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির ঘরের চাবি দিদির জিম্মায়। "দেহিপদ পল্লব মুদারম।" কথায় কথায় যারা টিভি চ্যানেলে ' ফোনো' দিতে (টেলিফোনে মতামত) অথবা 'বাইট' দিতে অভ্যস্ত তারাও নীরব। এ নিয়ে কিছু বলার নেই। ক্ষুরধার বুদ্ধির সাংবাদিকদের বুদ্ধির ক্ষুরে জং, যখন তখন নানা বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুষ্ঠান হয়। তা সে মোহর-কুঞ্জেই হোক অথবা মিলেনিয়াম পার্কে। সেসব মুখে গরম বক্তৃতা লোকে গিলে ভাবে কি দারুণ! ইমামদের বেতন দেওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে কোনও বিতর্কসভা হয়নি। কোনও চ্যানেল সাহস করবে না। কোনও বুদ্ধিজীবী বলতে আসবে না। ইমামদের বেতন দেওয়া মানে দেশের আঙুলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই সহজ সত্য সবাই বুঝছেন। কিন্তু কেউ 'ফোনো' দেবে না। বাইট দেবে না।

ইমামরা দরিদ্র। এই চরম ও চূড়ান্ত মিথ্যাটাকে বারে বারে আউড়ানো হচ্ছে। গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে হিন্দুধর্মের পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। দারিদ্র সন্ন্যাসীর ভূষণ। কোটি টাকার গদি ছেড়ে ভিখারী-সন্ন্যাসী হয় অনেকে। এটা হিন্দু ধর্মের পরম্পরা। তাই তারা কিছু প্রত্যাশা করে না। পূজারী ব্রাহ্মণ। বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে দোকানে পুজো করে বেড়ান। এটাই তৃপ্তি এটাই আনন্দ। অপরের মঙ্গলকামনায় নিজের আনন্দ। আর ইমামরা? ছোট-বড় শহরের বড় মসজিদের ইমামরা থাকেন রাজার হালে। আতর সুরমা আর পোশাক দেখে কে বলবে গরীব! অনেকের একাধিক বিবি। জমজমাট সংসার। গ্রামেগঞ্জের ইমামদের উপার্জন কম। কিন্তু গরীব কি? ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রামের লোকের।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু গ্রামে ইতিমধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে নয়। পুরোহিতে ইমামেও নয়। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইমামদের। কারণ অমুসলমানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়া অপরাধ। ইমাম একমাত্র মুসলমানের দেওয়া অর্থে পেট ভরাতে পারে। বেশ কিছু গ্রামের লোকেরা তাদের ইমামকে তা জানিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকা মানে কাফেরের টাকা। সে টাকা নিলে আর ইমামতি করা চলবে না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এসব কথা বললেন এক পরিচিত ইমাম।

সুতরাং একটাই পথ খোলা। সব ইমাম যদি কাফেরের টাকা নিতে না চায় তাহলে কি হবে? সরকারের প্রধানকে কি মুসলমান হতে হবে। ইমামরা এমন কোন শর্ত দিতেও পারে। যদি দেয় তাহলে পঞ্চায়েত.ভোটের আগে মমতাজ ব্যানার্জী থেকে 'মমতা বানু' হতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তারপর?

# অশনি সংকেত

## আসছে দিন বড় ভয়ংকর...!

নিত্যরঞ্জন দাস

ক) পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী জগদ্দল পাথরের ভিত আজ অপসারিত। একটানা ৩৪ বৎসর মার্কসবাদী সুশাসন পঃবঙ্গ ও বাঙালিকে কোথায় নিয়ে এসেছে, তা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তারও পূর্বে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারে প্রধান শরিক ছিল এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী সুশাসনের স্বর্ণালী অধ্যায়ের দুই একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়।

**সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড ঃ**

১৬ মার্চ ১৯৭০। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী। উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, CPI-M-এর ক্যাডার বাহিনী মহাকরনেই মুখ্যমন্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করে। অজয় মুখার্জী নিজের সরকারকেই "বর্বর সরকার" আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করেন। পর দিন ১৭ মার্চ CPI-M বাংলা বন্ধের ডাক দেয়। ওই দিন সকালে পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষায় একট বিরাট সশস্ত্র মার্কসবাদী হার্মাদ বাহিনী বর্ধমানের সাঁইবাড়ি আক্রমণ করে। দুই ভাইকে হত্যা করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। মা মূর্ছিতা হলে তাকে সুস্থ করা হয়। অতঃপর পৈশাচিক উল্লাসে নিহত পুত্রদের রক্ত দিয়ে ভাত মেখে তাকে খাওয়ানো হয়। এরপর খুনীরা একটি ৬ মাসের শিশুকে জ্বলন্ত চুল্লিতে নিক্ষেপ করে; হত্যা করে একজন গৃহশিক্ষক ও দুজন পরিচারিকাকে। ১৯৭১ সালে বর্ধমানের সেশন জর্জ বর্তমান শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, পুলিটব্যুরোর সদস্য বিনয় কোনার ও মানিক রায় সহ ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীদের আপীল দুবার হাইকোর্টে খারিজ হয়। ১৯৭৭ সালে CPI-M ক্ষমতায় এসে ৩০,০০০ বন্দীকে (অধিকাংশই মার্কসবাদ) মুক্তি দেয়। সাঁইবাড়ির আসামীদের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। আসামী মানিক রায় ছিলেন পলাতক। পরে অনিল বসু নাম নিয়ে লোকসভায় নির্বাচিত হন। All India Legal Aid Forum-এর জয়দীপ মুখার্জী এই বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন। কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টকে "কেস রেকর্ডস" পাঠাতে বলে। হাইকোর্ট জানায় সাঁইবাড়ির সকল রেকর্ডস চুরি হয়ে গেছে।

(**সূত্র ঃ** Convicts at large—ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় সচিব ভারত সরকার। The Statesman, 3-12-2009)

**মরিচ ঝাঁপি ঃ**

১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে CPI-M-এর সমর মুখার্জী, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ দণ্ডকারণ্যে গিয়ে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশ মণ্ডলের সঙ্গে প্রকাশ্য জনসভায় উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানায়। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ১,৬০,০০০ উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। এর মধ্যে ৩২,

০০০ উদ্বাস্তু মরিচ ঝাঁপিতে নতুন বসতি স্থাপন করে। কলোনীর নাম রাখা হয় নেতাজী নগর। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার মত পরিবর্তন করে। যেভাবেই হোক উদ্বাস্তুদের মরিচ ঝাঁপি থেকে উৎখাত করতে হবে। জারি করা হয় ১৪৪ ধারা ও অর্থনৈতিক অবরোধ। বন্ধ করে দেওয়া হয় জল ও খাদ্য সরবরাহ। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৭ মে প্রায় ১০০০ পুলিশ ও CPI-M-এর হার্মাদ বাহিনী আক্রমণ করে উদ্বাস্তুদের। চারিদিক অবরুদ্ধ। পালাবার পথ নেই। জলে কুমীর—ডাঙ্গায় পুলিশ। আর্থিক অবরোধে, অনাহারে ও অসুখে এবং সর্বশেষ পুলিশ ক্যাডার বাহিনীর যৌথ অভিযানে কত হাজার মানুষ যে মারা গেছে, তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রে তখন জনতা সরকার। দিল্লি থেকে জনতা পার্টির এক সংসদীয় দল মরিচ ঝাঁপি আসে ঘটনার তদন্তে। CPI-M-এর পুলিশ তাদের যেতে দেয়নি।

(**সূত্র ঃ** Island of Death অচিন্ত রূপ রায়। Times of India, 16-17 May, 2010)

**বিজন সেতু ঃ**

১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসের এক সকাল। স্থান, কসবার বিজন সেতু। CPI-M-এর হার্মাদ বাহিনী ১৯ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে বিজন সেতুর উপর পুড়িয়ে মারে, থানা কাছেই। কিন্তু পুলিশ যায় না। এই কেসের I.O. ছিলেন কসবা থানার গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। তিনি একদিন ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। পেছনে দ্রুতগতিতে আসা মোটরবাইকের পেছনের সিটে বসা কান্তি গাঙ্গুলী গঙ্গাধারবাবুকে গুলি করে পালিয়ে যান। মৃত্যু হয় গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের। পুলিশ কান্তি গাঙ্গুলীকে খুঁজে পায় না। সেই কান্তি গাঙ্গুলী CPI-M-এর একজন বড়মাপের নেতা, মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

**বানতলা ঃ**

২০০৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী। সরস্বতী পূজার ঠিক আগের দিন। রাত বারোটা নাগাদ কনেযাত্রী বোঝাই দুটি বাসকে রাণাঘাটের আইস মালি রোড লাগোয়া একটি মসজিদে ও মাদ্রাসার পাশে আটক করা হয়। একদল মুসলমান ড্রাইভারকে মেরে বাসের লাইট নিভিয়ে দেয়। যাত্রীদের অর্থ ও সোনা কেড়ে নেয়। অতঃপর সকল মেয়েদের মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে সারারাত ধর্ষণ করে। থানা খুব বেশি দূরে নয়।...কোনও বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জন মুসলমানের এই পাশবিক বর্বরতার নিন্দা করে না। কেন করবে? সরকারের পোষা এই স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবিরা একদিন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পেত অঢেল অর্থ। রাশিয়ায় কমিউনিজমের পতনের পর সে অর্থ প্রাপ্তি বন্ধ। কিন্তু এগিয়ে এসেছে মক্কা ও আরব দুনিয়া কুবেরের ধনভান্ডার নিয়ে। তাঁদের অর্থেই তো এই সকল বিদ্বজ্জনদের বিলাস-ব্যসন, ঠাঁট-বাট। এর কয়েক বৎসর পূর্বে চর্ম নগরী বানতলায় পদস্থ সরকারী কর্মচারী-অনিতা দেওয়ান ও তাঁর সঙ্গিনীদের গণধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়।

এরপর সাম্প্রতিক সংযোজন 'সিঙ্গুর', 'নন্দীগ্রাম' ও সর্বশেষ 'নেতাই কাণ্ড'। অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে নরহত্যার মিছিল। কমপক্ষে ৫৫,০০০ এর অধিক সেই মৃত্যু মিছিলের যাত্রী। প্রশ্ন জাগে, একি শুধুই বঙ্গীয় কম্যুনিষ্টদের অনন্যসাধারণ অম্লান কীর্তি...? বোধহয় না। জার্মানীর হিটলার। ৬০ লক্ষ ইহুদী হত্যা করে তিনি ফ্যাসিবাদী বলে নিন্দিত। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাণপুরুষ, নব্য রাশিয়ার রূপকার মার্শাল স্ট্যালিন ৫ কোটি রাশিয়ানকে হত্যা করেও মার্কসবাদীদের নিকট বিশ্ববন্দিত। চীনের মহান নেতা মাও-সে-তুঙ-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ১৯৬৬-৭৬, এই ১০ বছরে ৪ কোটি চীনাকে হত্যা করা হয়। শান্তি ও প্রেমের দেশ কম্বোডিয়া—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। লোকসংখ্যা

মাত্র ৫০ লক্ষ। কমিউনিষ্ট নেতা পলপট ক্ষমতা দখল করে হত্যা করে ২০ লক্ষ মানুষকে। রুমানিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা চসেস্কু, তাঁর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান দমন করতে একদিনে হত্যা করে ১০,০০০ রুমানিয়ান নাগরিক। এই হল মহান মার্কসবাদ! আজ বিশ্বব্যাপী নিন্দিত-ধিকৃত। বস্তুত মাত্র শতবর্ষের মধ্যে কোনও আদর্শের এমন কলঙ্কজনক অপমৃত্যু ঘটেনি...!

কিন্তু আশ্চর্য! সরকারী অর্থে পরিপুষ্ট এদেশের বুদ্ধিজীবি ও বিদ্বজ্জন (এঁরা এতদিন CPI-M-এর পদলেহন করে নিজেদের পকেট ভর্তি করেছে। এখন ভাঁড়ার শূন্য দেখে অথবা অধিক প্রাপ্তির আশায় দিদির দলে ভীড় জমিয়েছে) একেবারে রুদ্ধ কণ্ঠ। নেই কোন প্রতিবাদ বা ধিক্কার! এর কারণ এঁরা সকলেই ছদ্ম কমিউনিষ্ট—অথবা মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত। দ্বিতীয়তঃ এরা রাশিয়ার কাছ থেকে পেত প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন। তাই এঁরা 'মাওবাদীদের' ও সমর্থক। মাওবাদ তো মার্কসবাদেরই প্রকার ভেদ। দিদি নিজেও বলেছেন "বামপন্থার আদর্শ খারাপ নয় কিন্তু CPI-M-এর আদর্শ বামপন্থা নয়।"

(Leftism is not bad idelogy, but CPMism is not leftism-Times of India-13.03.2011)

পরিবর্তনের আহ্বান তবে কি যথার্থ বামপন্থা বা কমিউনিষ্ট মতবাদের বিজয় কেতন ওড়াবার জন্য? তাই কি 'মাওবাদী শ্রেণী সংগ্রামের' প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন?

**খ)** ম্যাডামের নির্দেশে গঠিত সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে দরিদ্রতম মানুষের সংখ্যা ২২ কোটি। ১৮ কোটি হিন্দু, ৪ কোটি মুসলমান। দরিদ্র হিন্দু নয়, মুসলমানের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস-CPI-M—তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে চলছে প্রবল প্রতিযোগিতা।

সোনিয়ার বশংবদ প্রতিবন্ধী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর দৃপ্ত ঘোষণা "দেশের জাতীয় সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদের (মুসলমান) আছে অগ্রাধিকার।" মুসলমানের কল্যাণের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এসব কথা বললেই সংবিধানের দোহাই দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সার্বজনীন ভোট নয়—মাত্র ১৪% ভোটে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যরা গঠন করে 'সংবিধান সভা' (Constituent Assembly)। আসন সংখ্যা মোট ২৯২। আসনের বিন্যাস এই ভাবে করা হয় ঃ মুসলমান-৭৮, শিখ-৪ ও সাধারণ-২১০। দেশের নাম হিন্দুস্থান, ৮০ শতাংশ মানুষ হিন্দু। অথচ দেশের সংবিধান রচনায় হিন্দুর কোন ভূমিকা নেই! বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ K. V. Rao বলেন ঃ রচিত সংবিধানটিকে গণভোটে পেশ করা হয়নি। তাই এই সংবিধানকে জনগণের সংবিধান বলা যায় না। J. C. Johari বলেন ঃ জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শনে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম জাতির দাবী মেনেই বিভক্ত হয় ভারত। পূর্ণ সহযোগিতা করে গান্ধী, নেহেরু ও কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট দল। ১৫ জুন ১৯৪৭। দিল্লিতে A.I.C.C.-এর অধিবেশনে গান্ধী ৪০ মিঃ ভাষণে দেশ বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করেন (R. C. Majumder-History of the Freedom Movement on India. Vol.III, Page 671)। কমিউনিষ্টরাও দেশ বিভাগের জন্য মুসলমানের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন করে। পার্টি দলিলে তাদের সদম্ভ ঘোষণা— "একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই মুসলমানের পাকিস্তান দাবীকে সঙ্গত বলে মনে করে; এবং দাবী আদায়ের জন্য কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট-মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান

জানায়।" (ভবানী সেন-সম্পাদক, সি.পি.আই. মুক্তির পথে বাংলা)

অবিভক্ত ভারতে মুসলমান ছিল ২৩%, হিন্দু ও অন্যান্য ৭৭%। দেশভাগ করে মুসলমান পাকিস্তানের জন্য জমি নিয়েছে ৩০%। বাকি রইল ৭০% জমি। সে জমি তো হিন্দুর জন্য। তবে মুসলমান এদেশে থাকে কোন অধিকারে? শুধু অধিকার নয়—সর্ববিষয়ে তাদের অগ্রাধিকার। যে দুষ্ট চক্র দেশভাগ করেছে, **সর্বনাশা "ধর্মনিরপেক্ষতার"** তারাই প্রবর্তক। উদ্দেশ্য—বিভক্ত ভারতকে পুনরায় খণ্ডিত করা। পাঁচটি সাদি ও ২৫টি সন্তান এবং ধর্মনিরপেক্ষদলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে জলস্রোতের ন্যায় বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশ ভারতে জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাসে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯৯১-২০০১ এই দশ বৎসরে দেশে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

**পশ্চিমবঙ্গ— হিন্দু-১৪.২%, মুসলমান-২৫.৯%**

**সারা ভারত— হিন্দু-১৯.৩%, মুসলমান-২৯.৫%**

(সূত্র ঃ Economic and Political Weekly 25-09-2004)

জনসংখ্যা বিশারদদের মতে—"২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমান ৫৫ কোটি (১৯৯০ সাল) হিন্দুকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ভারত হবে ইসলামি রাষ্ট্র (সূত্র The Statesman 18-07-90 )। এই চক্রান্তের প্রথম শিকার হবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে ভোট ভিখারী সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চলেছে তীব্র প্রতিযোগিতা। তাদের দাবি—মুসলমান সমাজ অনুন্নত, শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। অতএব শিক্ষা ও চাকুরীতে তাদের ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিতে হবে। মুসলমানের বহুবিবাহ, অবাধ প্রজনন। তাদের দারিদ্র ও অশিক্ষা কে ঘোচাবে? তাই বলে হিন্দুর অর্থে (TAX) তাদের অন্যায্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে? এ কেমন আবদার? কিন্তু মুসলিম ভোটের কাঙাল যারা তারা এসব যুক্তি মানতে নারাজ।

মুসলমানদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই বঙ্গের CPI-M সরকার বিশাল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত—"পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা আজ দেশের গর্ব।" শীর্ষক পুস্তিকায় দাবী করা হয়েছে; ১৯৭৭ সালে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা সংখ্যা ছিল ৪৩৮৮। ২০১০ সাল তা হল ৪,৫০,০০০। ১০০ গুণ বৃদ্ধি! অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ৬১০ কোটি টাকা। এতো সরকারি নথীভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা। মক্কা ও আরবের টাকায় যে কয়েক হাজার মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে সে হিসাব কে রাখে? এই বেআইনি মাদ্রাসাগুলি হল ইসলামি জেহাদি বাহিনীর গোপন আস্তানা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ অভিযোগ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। পরে মুসলমানদের চাপে মুখ্যমন্ত্রীকে তার মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়। কি পড়ানো হয় মাদ্রাসায়। আরবী, ইসলামের ইতিহাস, কোরাণ, হাদিস, আকায়িদ, ফিকাহ, ফারায়েজ ও মুসলমান মনীষীদের জীবনী। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিষয়গুলি পড়তে হয়। মুসলমানদের তুষ্ট করতে CPI-M সরকার কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। এখানেই শেষ নয়—পাকিস্তান সৃষ্টি করার জন্য যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কু-খ্যাত; বাংলার দুই রত্ন বুদ্ধ-প্রণবের যৌথ উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়েছে সেই A.M.U.-এর একটি ক্যাম্পাস। ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। রবীন্দ্র সদনে মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন— "সংখ্যালঘুরা যাতে পিছিয়ে না থাকে তার জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্ম সংস্থানের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে অনুদান ও ঋণদানের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। **এবং অনগ্রসর সংখ্যালঘুদের (মুসলমান) জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে (আঃ বাঃ ২৮-০৩-১১)। আরও ৮ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে OBC তালিকায়...। রাজ্যের ২ কোটি ২ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষই এখন সংরক্ষণের আওতায়।** —(আঃ বাঃ ১৮-০৮-২০১০)

"দিদি" আর একধাপ এগিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"ক্ষমতায় এলে তিনি আরও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা স্থাপন করবেন। বৃদ্ধি করা হবে মুসলিম সংরক্ষণ। দেশের ৩,০০,০০০ ইমামকে ভারত সরকার প্রায় সরকারি কর্মচারীদের হারে বেতন দেন। তাদের বেতন আরও বৃদ্ধি করার জন্য "দিদি" ও CPI-M-এর বৃন্দা কারাত দীর্ঘদিন ধরে দাবী করছেন। "দিদি" উর্দু ভাষার (পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—এদেশের মুসলমান উর্দুর মাধ্যমেই নতুন নতুন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে) উন্নতির জন্য সোচ্চার। উর্দু শায়রী আউরে মুসলমানদের তুষ্ট করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার উন্নয়নের জন্য কথাটি বলেন না। যে সংস্কৃত ভাষা ভারতসহ পৃথিবীর সকল ভাষার জননী স্বরূপা। "দিদি" মাদ্রাসার উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সদাই চিন্তিত। কিন্তু "টোলের" কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন না।

বিনাশ কালে বুদ্ধিনাশ। ভারতের প্রথম যোগ্যতম স্বরাষ্ট্র সচিব V. P. Menon জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন—"যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল ভুলে যায়, তার পতন আসন্ন।" আমরা মুসলিম শাসনের রক্তাক্ত ইতিহাস ভুলে গেছি, তাই মুসলমানের দৌরাত্ম ও আগ্রাসন ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মুসলমান হিন্দু নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, মন্দির ভাঙছে ও বিগ্রহের অবমাননা করছে। আরবের অর্থে ও সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে সংবাদ মাধ্যম ও টিভিতে সে সংবাদ প্রকাশিত হয় না। "দিদি" রমজান মাসে মাথায় 'হিজাব' পড়ে নমাজ পড়েন। সম্প্রতি ভারত সফররত মক্কার ইমামকে মহার্ঘ শাল উপহার দিয়ে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বর্তমানে ফুরফুরা শরীফ ও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামি মুখ। এই ইমাম বরকতি তসলিমা নাসরিনের মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিলেন ৫ লক্ষ টাকা। তসলিমার অপরাধ কি? তিনি "লজ্জা" উপন্যাসে বাংলাদেশে হিন্দুর উপর মুসলমানের নৃশংস বর্বর অত্যাচারের কাহিনী চিত্রায়িত করেছিলেন। তাই তাঁর উপর মুসলমান ও জন্মসূত্রে হিন্দু সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরা ক্ষুব্ধ। একদা কংগ্রেস, বর্তমানে তৃণমূল নেতা ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর, তসলিমাকে বিতাড়নের দাবীতে মুসলমান রাজধানী কলকাতায় সারাদিন ব্যাপী তাণ্ডব করেছিল। বুদ্ধ-মমতার কোনও প্রতিবাদ ছিল না।

**দেগঙ্গা ঃ**

বিগত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অভাবনীয় সাফল্যের পর মুসলমান আরও বেপরোয় হয়ে ওঠে। দেগঙ্গায় তারা তার স্বাক্ষর রেখেছে। ঘটনার সূত্রপাত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ দুপুরে। চট্টল পল্লীতে হিন্দুদের কালী মন্দির ও শনিমন্দির। পাশে কবরখানা। কমন প্যাসেজটা কবরখানার জায়গা এই দাবী করে মুসলমান প্রাচীর দেওয়ার চেষ্টা করে। হিন্দুরা বাধা দেয়। প্রকৃত ঘটনা হল জায়গাটি রাণী রাসমনি এস্টেটের। বর্তমানে সরকারি খাস জমি। গত ৪০ বৎসর ধরে হিন্দুরা সেখানে দুর্গা পূজা করে। মুসলমান তখনকার মত নিরস্ত্র হলেও হুমকি দেয়। ইফ্‌তার শেষ করে প্রায় ২০০০ সশস্ত্র মুসলমান কয়েক কিমি এলাকা জুড়ে সৃষ্টি করে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। লুটপাট, মারধর ও হিন্দুর দোকান ও বাড়িতে আগুন লাগায়, ধর্ষণ করে মা-বোনেদের। কালীমন্দির

ভেঙ্গেছে-ভেঙ্গেছে মাকালীর মূর্তি। শনিঠাকুরের বিগ্রহ ভেঙ্গে তার উপর মুসলমান প্রস্রাব করে। তাবৎ আক্রমণ ঘটেছে পুলিশ ও র‍্যাফের সামনেই। সবটাই একতরফা। মুসলমান আক্রমণকারী, হিন্দু আক্রান্ত। আঃ বাঃ পত্রিকায় (৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০) লেখা হল—"পুড়ল ৫০টি বাড়ি (প্রকৃত সংখ্যা ৫০০) ও দোকান।...৩০০টি দোকান ও বাড়িতে চলল ভাঙচুর। সেনাও নামানো হল। ৮ সেপ্টেম্বর সেনা টহলের মধ্যে লুট চলে।" ঘটনা সামাল দিতে বিশাল বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে ডি, এস, পি (ট্রাফিক) অশোক রায় এবং অন্য একজন ডি, এস, পি সেখানে পৌঁছানো মাত্রই উন্মত্ত মুসলিম জনতা তাদের মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারে। এই খবরটি আঃ বাঃ পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। পুলিশ ও র‍্যাফ নীরব দর্শক। রমজান মাস বলে তাদের গুলি চালানোর হুকুম নেই। কিন্তু রমজান মাসে হিন্দু নির্যাতনে মুসলমানের আছে অবাধ অধিকার।

আক্রান্ত হিন্দুদের অভিযোগ, তৃণমূল এম. পি. হাজী নু[illegible] সেলামের চক্রান্তেই এই আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। লাগোয়া মসজিদে মাইক না বসানোর জন্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু হাজী সাহেব ইমামের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে মসজিদে মাইক লাগিয়ে দেন। এ নাকি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এত বড় ঘটনা, মিলিটারি নামল, কলকাতা এত কাছে—না কোন বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জন প্রতিবাদ করেনি। যে অগ্নিকন্যা রিজানুরের আত্মহত্যায় বুক চাঁপড়ে কেঁদেছিলেন—তিনি একটি বারের জন্যও দেগঙ্গা গেলেন না। অগ্নিকন্যার শ্লোগান— "মা-মাটি-মানুষ"। দেগঙ্গায় ধর্ষিতা হিন্দুমায়ের আর্তনাদ কি তাঁর কর্ণকুহরে পৌঁছায়নি? শুকিয়ে গিয়েছিল কি অশ্রুর উৎসমুখ? অগ্নিকন্যার অগ্নিশিখা কি নির্বাপিত ছিল?...এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে দেগঙ্গায় হিন্দুরা দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩১টি পূজা কমিটি এবার দুর্গাপূজা করেনি।

**দেগঙ্গার শিক্ষা ঃ**

পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে "মা-মাটি-মানুষ"। দেশভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা সেদেশে পরিবর্তনের জন্য কম করেনি। শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে তাঁদের অবদান কম নয়। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরি। সর্বোপরি পূর্ববাংলার মাটিকে স্বাধীন করার জন্য বুকের তাজা রক্ত তারাই ঢেলে দিয়েছিল (মুসলমান নয়)। সে মাটি আজ কার? তাই সংশয় জাগে এ বাংলার মাটিতে হিন্দুর অধিকার থাকবে তো???

"দেগঙ্গার ঘটনা পড়লে কি মনে হয় না, এভাবে হিন্দুদের উপর যদি অত্যাচার হয়—তবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দু লুপ্ত হয়েছে, (কাশ্মীরও আজ হিন্দু শূন্য) বাংলাদেশের অবশিষ্ট হিন্দুরা যেমন অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটে ভুগছে; ভারতেও একদিন তাই হবে।" লিখেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্যপাদ স্বামী যুক্তানন্দ। তাঁর প্রশ্ন—"পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও কি এবার অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটের মুখোমুখি হতে চলেছে? আজ যারা অত্যাচারিত তারা অসঙ্ঘবদ্ধ দুর্বল। সুতরাং হিন্দুকে বাঁচার তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই। হিন্দু যেন মনে রাখে, এই ভূমিই তার শেষ ভূমি। এরপর অত্যাচারীর হাতে জীবনদান, না হয় অতল সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে হিন্দুকে বাঁচাতে পারে একমাত্র প্রকৃত হিন্দুই। কোন রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতা-নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, প্রশাসন হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। হ্যাঁ, আসবে তখনই, যখন তারা দেখবে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিশালী, তাদেরও ভোটের মূল্য আছে।" (প্রণব, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-১৪১৭)

# মমতার রকম-সকম

তথাগত রায়

২০১১ সালের মে মাসে পশ্চিমবাংলায় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। যে সব মানুষ কোনদিনই মমতাকে, তৃণমূল কংগ্রেসকে বা কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন না তার মধ্যে বহু মানুষ চোখ বুজে মমতার দলকে ভোট দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমাদের দল, অর্থাৎ বিজেপি'র সমর্থক ছিলেন, এমনকি সিপিএম সমর্থক পর্যন্ত ছিলেন। কারণটা খুব সরল। মানুষ ৩৪ বছরের সিপিএম রাজত্বের খুনোখুনি, স্বৈরাচার, দলবাজী, ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে পারছিলেন না। মুহ্যমান মানুষ যেমনি তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে তেমনি করে মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন সিপিএম সরকারকে সরানোর জন্য। তাঁদের নিশ্চয়ই দোষ দেওয়া যায় না—তাঁরা বলেছিলেন প্রথমে এই চৌত্রিশ বছরের পাপ বিদায় হোক—তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

সেই সব মানুষের বৃহদংশ আজকে, যখন নতুন সরকারের এক বছর হতে চলেছে, একটু অন্যরকমভাবে ভাবছেন। তাঁদের আজকে অনেকেরই মুখে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ইংরাজি প্রবাদ বচন, যার ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় "আমরা কি তপ্ত কটাহ থেকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম", "এ যে দেখছি অসুখের চাইতে ওষুধ আরো মারাত্মক" এবং সবচেয়ে মারাত্মক "আমরা চেয়েছিলাম তাড়াতে হার্মাদ পেলাম এক উন্মাদ" (অধীর চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা)। বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা একটু অন্য ভাষায় বলেছেন, রঘু ডাকাতকে তাড়িয়ে কালু ডাকাতকে আনা হল। সম্ভবত এইটিই সবচেয়ে লাগসই উপমা, কারণ বামফ্রন্ট শাসনের চাইতে খারাপ কিছুই হতে পারে না, বর্তমান সরকার খারাপ, কিন্তু বামফ্রন্ট আরো অনেক, অনেক বেশি খারাপ।

কিন্তু বামফ্রন্ট তো এখন ক্ষমতায় নেই, আছেন মমতা। তৃণমূল নয়, মমতা। কারণ মমতা ছাড়া তৃণমূলের যেমন কোনও অস্তিত্ব নেই, তেমনি মমতার অঙ্গুলিহেলন ছাড়া তৃণমূলের কোনও নেতার কানাকড়ি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। অতএব মমতা। এখন প্রশ্ন, এই প্রায় একবছর আমাদের কেমন গেল?

নির্বাচনে বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল মন্ত্রিসভা তৈরি। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম পুলিশ এবং স্বাস্থ্য, এরকম দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাছে রেখে ছিলেন, এর সঙ্গে আরো দু-তিনটে ছোটখাট মন্ত্রকও রেখে দিলেন। পুলিশ এবং স্বাস্থ্য, এই দুটো রাজ্য সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক, যার পিছনে মন্ত্রীকে প্রচুর সময় দিতে হয়। বিদ্যুৎও রেখে দিয়েছিলেন, পরে সেটা মনীশ গুপ্তকে দিলেন। কিন্তু বাকি মন্ত্রকগুলোর বিতরণ দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠল। সারাজীবন নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রাত্য বসুকে কেন উনি শিক্ষামন্ত্রী করলেন এবং বাংলার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে কেন উনি কারিগরি শিক্ষার ভার দিলেন, বোঝা গেল না। প্রযুক্তিগত শিক্ষা (যার সঙ্গে এই প্রবন্ধকার গত বাইশ বছর ধরে সম্পর্কিত) কার্যত দুভাগ হয়ে গেল—ব্রাত্য বসু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর দায়িত্বে, রবিরঞ্জনবাবু পলিটেকনিক ও ডিপ্লোমা কলেজের দায়িত্বে। এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে আইনজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নূরে আলম চৌধুরীকে পশুপালন মন্ত্রী করা।

পনেরোই আগস্ট আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা দিবস, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে স্যালুট নেন (যদিও এই ব্যাপারে প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় ২৬ জানুয়ারি)। এই দিন টিভি খুলে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী এক বিচিত্র সাজে সজ্জিত—রক্ষণশীল মুসলিম মহিলারা যে পোশাক পরে তিনিও সেই পোশাক পরেছেন। মুখমণ্ডলটা ঢাকেননি বটে, কিন্তু চিবুকের কাছে ফিতে বেঁধে বোহরা মুসলিম মহিলাদের মত সেজেছেন। স্বাধীনতা দিবস মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটা ভাবগম্ভীর ব্যাপার হওয়া উচিত—এ তো 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি' বা 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রতিযোগিতা নয়! মুখ্যমন্ত্রীর তো এটা স্বাভাবিক বেশ নয়, উনি তো শাড়িই পরেন, আজ হঠাৎ এই সং সাজার অর্থ কী? মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের বাঙালি মহিলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমনকি খালেদা জিয়াও তো এমন পোশাক পরেন না!

AMRI হাসপাতালে আগুন লাগল, বহু রোগী এবং বেশ কিছু কর্মী পুড়ে মারা গেলেন। মমতা ঘটনাস্থলে এলেন—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর ওঁর ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার কোন দরকার ছিল কি? ওখানকার পরিস্থিতি তো তারপর দমকলকর্তা ও পুলিশ কর্তারা সামলাবেন, দমকলমন্ত্রীও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী! মুখ্যমন্ত্রী যদি দমকলকর্তা ও পুলিশকর্তার কাজ করেন তা হলে মুখ্যমন্ত্রীর কাজটা করবেন কখন?

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে চোলাই খেয়ে বেশ কিছু মানুষ মারা গেলেন। চোলাই-মৃতদের পরিবারের জন্য সরকার থেকে দু'লক্ষ টাকা করে সরকারী অনুদান ঘোষণা করা হল। করলেন অবশ্যই মমতা, কিন্তু এটা কী করলেন? যারা বেআইনী চোলাই খায় তাদের মৃত্যুসংবাদ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। কারণ নেশার তীব্রতা বাড়ানোর জন্য চোলাইতে মিথাইল অ্যালকোহলের মত মারাত্মক বিষ মেশানো হয়। এসব কথা চোলাইখোরদের না জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তারা ঝুঁকি নিয়ে চোলাই খেয়েছেন। যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক, বিশেষ করে মৃতের পরিবারের জন্য। কিন্তু এরকম ঝুঁকি নিয়ে যারা চোলাই খায় তাদের কি দু'লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত?

এর পরেও দুটো কথা আছে। প্রথম, দুষ্টু লোকে বলছে, মমতা এটা করেছিলেন শুধু মুসলিম ভোট পাবার জন্য, কারণ মৃত চোলাই- খোরদের বেশিরভাগই মুসলিম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একই জিনিস মমতা ও বুদ্ধদেব দুজনেই করেছিলেন রিজওয়ানুরের মৃত্যুর পর। না হলে প্রেমাঘাতী মৃত্যু বা আত্মহত্যা তো অনেক হয়েছে তার কোনটায় মুখ্যমন্ত্রী বা বিরোধী নেত্রী দৌড়ছেন কি? দ্বিতীয়, তৃণমূল ক্যাডাররা গিয়ে মৃতদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে এসেছে, খবরদার, প্রাণের মায়া থাকে তো দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে যাবি না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ রাজ্য সরকারের ভাঁড়ে তো মা ভবানী!

পার্ক হোটেলের বাইরে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাকে গাড়িতে তুলে ধর্ষণ করা হল সে ব্যাপারে মমতার ভূমিকা ন্যাক্কারজনক। প্রথমে বললেন, ধর্ষণই হয়নি, সব 'সাজানো ঘটনা'। তারপর পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার শ্রীমতী দময়ন্তী সেনকে (যিনি অভিযোগকারিণী মহিলার কথা বিশ্বাস করে অপরাধের তদন্ত করছিলেন, এবং মূল ধর্ষণকারী কাদির খাঁ বাদে বাকি সব অপরাধীদের ধরেছেন) ধমকধামক করলেন, এবং শেষপর্যন্ত তাকে বদলি করে দিলেন। এর ফলে কি নারীধর্ষণকারীরা উৎসাহ পাবে না?

ইদানীংকার মধ্যে মমতার দুটি কীর্তি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে এবং সঙ্গতভাবেই হয়েছে। একটি হল ক্লাব এবং ইমামদের অনুদান দেবার ব্যবস্থা করা। এটি আর কিছুই নয়, সরকারি পয়সা খরচ করে ভোট কেনার চেষ্টা। এবং এটি করা মমতার পক্ষে যথেষ্ট মুস্কিল, কারণ এতে সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হচ্ছে—তাছাড়া ইমামদের অনুদান দেওয়ায় সংবিধানের মুখবন্ধ বা ভূমিকা (Preamble) টাই লঙ্ঘিত হচ্ছে। আর একটি হল লাইব্রেরিতে কি কি কাগজ রাখা যাবে সে সম্বন্ধে মমতার ফতোয়া। এটির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মমতা ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন। একবার বললেন ব্যয়সংকোচনের জন্য কাগজের সংখ্যা কমানো হচ্ছে, আর একবার বললেন 'মুক্তচিন্তার প্রসারের' জন্য এই ব্যবস্থা, কিন্তু শিশির অধিকারী হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বললেন, যে সব কাগজ সরকারের কথা লেখে না সরকারের অধিকার আছে তাদের গ্রাহক না হবার। শিশিরবাবুর এই যুক্তি আইনের ধোপে টিকবে না, সম্ভবত শিশিরবাবুও জানেন টিকবে না, জেনে-শুনেই মন্তব্য করেছেন।

এতেই শেষ নয়, আরও আছে। রেলবাজেট নিয়ে মমতার কেরামতি, অটোর ভাড়া বাড়তে না দেওয়া, যে সব দলনেতারা একটু প্রাধান্য পেয়ে যান তাদের ডানা ছাঁটা, রাইটার্সে না বসে সারা রাজ্যে দৌড়ে বেড়ানো, এ সবই মমতার বিচিত্র প্রশাসনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা কি জানেন না যে এগুলি করে তিনি হাস্যাস্পদ হচ্ছেন? তাহলে কেন করছেন?

এই 'কেন'-র উত্তর পেতে হলে মমতার বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন আচরণের দিকে তাকাতে হবে। আমরা দেখতাম, যেখানে অত্যাচার হচ্ছে, যেখানে সিপিএম খুন করছে, নির্যাতন করছে, দলবাজী করছে, সেখানেই মমতা দৌড়ে চলে যাচ্ছেন (যেখানে যেতে পারেন নি সেখানে বিজেপি'র সাহায্য নিয়ে দৌড়তে এবং পরে তা অস্বীকার করতে, তাঁর বাঁধে নি, যেমন নন্দীগ্রাম)। আমরা দেখেছি, এবং এবম্বিধ আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছি, এখনও করি।

কিন্তু গণ্ডগোল হচ্ছে। রাজনীতি বলতে মমতা এইটাই বোঝেন, আর কিছু বোঝেন না। তাই তিনি দৌড়ে বেড়ান আজ উত্তরবঙ্গ, কাল জঙ্গলমহল, পরশু সুন্দরবন, পরশু ডোমজুড়। কোথাও তিনি বিমল গুরুং-এর সঙ্গে কথা বলেন, কোথাও মাওবাদী দমনের ব্যাপারে খোঁজ নেন—আর সুন্দরবন গিয়ে তিনি ইষ্টিমার চালান, ডোমজুড়ে কাপড়ে পুঁতি সেলাইয়ের চেষ্টা করেন। বিমল গুরুংরা বা মাওবাদীরা রাজ্যের সমস্যা বটে, কিন্তু এগুলি তো রাজ্যের প্রধান সমস্যা নয়! কলকাতাকে লন্ডন বানানো বা দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড বানানোও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না! রাজ্যের প্রধানতম সমস্যাবলীর মধ্যে আছে আর্থিক দেউলিয়া অবস্থা, সর্বব্যাপী বেকারী, শিল্পপতিদের রাজ্যে লগ্নীতে অনীহা, বিদ্যুৎ সংকট, চাষীদের শস্যের দাম না পাওয়া ইত্যাদি। এগুলি সম্বন্ধে মমতার কি চিন্তা? এগারো মাসে তিনি এর সমাধান না করতে পারুন, কিভাবে সমাধানের পথে এগোবেন তার একটা রূপরেখা তো দেখাতে পারেন, হদিশ তো দিতে পারেন!

অতীব দুঃখের বিষয়, এইসব আশু সমস্যা নিয়ে মমতার কোনো চিন্তাই নেই। চিন্তা উনি করতেই পারেন না। চিন্তা করতে যে-মানসিক গঠন দরকার, যে-ধৈর্য্য দরকার, পাঁচজন মন্ত্রী ও আমলার সঙ্গে বসে আলোচনা করার যে-মানসিকতা দরকার সেটা সৃষ্টিকর্তা ওঁকে দিয়ে পাঠান নি। উনি এসব পারেন না, করবেনও না, অন্য কারুকে করতে দেবেনও না, কারণও তাহলে

সেই অন্য কেউ ওঁকে ছাপিয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছিল বর্তমানে ওঁর মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে। সন ২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সুব্রতবাবু কলকাতার মেয়র হিসাবে আর যা-ই করুন, কর্পোরেশনটাকে আর্থিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সফলও হয়েছিলেন। তার ফলে মমতার কোপে পড়লেন এবং তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। বেরিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, মমতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, পরশ্রীকাতরতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের ক্যাবিনেট সঙ্গীদের ব্যাপারে পরশ্রীকাতর হন, তা হলে সেই রাজ্যকে একমাত্র ঈশ্বরই বাঁচাতে পারবেন।

চৌত্রিশ বছর ধরে সিপিএম-এর শয়তানী, দলবাজী, খুনখারাপি, স্বৈরাচার মানুষ দেখেছেন, তার আগের পাঁচ বছর কংগ্রেসের একই কীর্তি দেখেছেন। গত এগারো মাস ধরে তৃণমূলের কীর্তি দেখছেন। তাহলে বাকি রইল কাকে দেখার? যে দল গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্যে সুশাসন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছে তাকেই শুধু দেখা বাকি আছে।

# কাহার জন্য

তাহা হইলে পুরোহিতরাই বা বাদ কেন?—মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রশ্ন করিতেই পারেন রাজ্যবাসী। অসার তর্কের নহে, এই প্রশ্ন মৌলিক নীতির। এই প্রশ্ন ধর্মনিরপেক্ষ বহুসংস্কৃতিবাদের। মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজ্যের মসজিদগুলির ত্রিশ হাজার ইমামের জন্য আর্থিক সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করেন, তবে অন্যান্য ধর্মের যাজকরাই বা নহেন কেন? আর্থিক বিবেচনাতেই যদি এই পদক্ষেপ, তবে পুরোহিতদেরও তো এক বড় অংশ রীতিমত দুঃস্থ, গুরুদ্বার বা অন্যান্য নানা ধর্মস্থানের চিত্রও একই রকম। সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠীর দিকে মনোযোগই যদি এই পদক্ষেপের হেতু হইয়া থাকে, তবে শিখগুরু কিংবা খ্রিস্টান ধর্মযাজকরাও সুযোগ দাবি করিতে পারেন। আর যদি পশ্চাৎপরতার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হয় ভিত্তিতেই গোলমাল, কেননা রাজ্যের মুসলিমদের এক বিরাট অংশ অর্থনৈতিকভাবে পিছাইয়া থাকিলেও, ইমামরা কিন্তু পশ্চাৎপরতার পিরামিডের উচ্চতর মহলের বাসিন্দা। সুতরাং মাসিক আড়াই হাজার টাকার ভাতা সম্ভবত তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের সাধারণ্য ধর্মভ্রাতাদের নিকট অনেক বেশি জরুরি ছিল। তবে, এ সব সাত পাঁচ যুক্তি-প্যাঁচ অবান্তর। স্পষ্টতই ইমামদের জন্য এই ঘোষণা কোনও সুযুক্তি-প্রসূত নহে, কূট-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূত।

কূট হইলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাজনৈতিক কৌশল বহুপরিচিত, বহুনিন্দিত, ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক। ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ধর্মকৌশল-সর্বস্ব রাজনীতি এই দেশ বহু দেখিয়াছে, এবং তাহার বিষবৎ অগ্নি এই দেশকে বহু বার পুড়াইয়াছে। কংগ্রেস এই কৌশল কম ব্যবহার করে নাই, সংখ্যালঘু-তোষণের নামে মৌলবাদীদের তোষণ ও পোষণ করিয়াছে, মমতার মতো একই পদ্ধতিতে, একই পুরস্কারে, একই পোশাকে। তাহাতে ফল ভাল হয় নাই। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিমদেরও উন্নতি হয় নাই, দল হিসাবে কংগ্রেসের কপালেও জয়টীকা

অঙ্কিত হয় নাই। মাঝখান হইতে ফুঁসিয়া উঠিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা নামক কালসর্পের তীব্র আক্রোশ, এ পক্ষে ও পক্ষে সর্ব পক্ষে। যে প্রশ্ন দিয়া এই নিবন্ধের শুরু, আজ যদি মুখ্যমন্ত্রীকে কেহ সেই প্রশ্ন করে, তাহা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাপ্রসূত বলিয়া গণ্য হইবে। অথচ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্নটি কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গত, যুক্তিনিষ্ঠ। সাম্প্রদায়িক হিংসাকে এ ভাবে যুক্তিনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়া ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটিকেই দুর্বল করিয়া ফেলা—অহেতুক, অসঙ্গত ও ভোটনির্ভর রক্ষণশীলতা-তোষণের অবধারিত ফল ইহাই।

অথচ ভোটের কথা না ভাবিয়া যদি সত্যই কোনও নেতা দারিদ্র ও পশ্চাৎপরতার কথা ভাবেন, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে সহায়তার হাত বাড়াইয়া দিতে চাহেন, বহুবিধ পথ তাঁহার সামনে খোলা। শিক্ষাবিস্তার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি—আবশ্যিক দুইটি পথ। আবশ্যিক হইলেও নিশ্চয়ই এ পথ কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্টসাধ্য বলিয়াই যদি আবশ্যিক পথ সমূলে ত্যাগ করিয়া 'শর্টকার্ট'-এর দ্বারস্থ হইতে হয়, মুসলিম সাধারণ্য হইতে দৃষ্টি সরাইয়া রক্ষণশীলতার স্তম্ভ ধর্মগুরু-তোষণের সস্তা পথই ধরিতে হয়, তবে পশ্চাৎপরতা বা দারিদ্র, কোনটিরই দূরীকরণ কোনও কালে সম্ভব নহে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারও কৌশলের রাজনীতি কম করে নাই, তবে সত্যের খাতিরে, অন্তত মাদ্রাসা পাঠক্রমকে তাহারা মূলস্রোতে আনিয়া কর্মসংস্থানের সুরাহার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও পর্যন্ত নূতন সরকারের তরফে এমন প্রয়োজনীয় প্রয়াস দেখা যায় নাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অন্তত ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রশ্নে, রাজনীতি যেন এ রাজ্যে ক্রমশই আরও বিপজ্জনক শর্টকার্টের নীতি হইয়া উঠিতেছে। *সৌজন্যে : আনন্দবাজার, ৫.৪.১২*

# মামলায় হেরে গেলে ইমামদের ভাতার টাকা ফেরত দিতে হবে

## রাজ্যকে জানাল হাইকোর্ট

**আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা:** ইমামদের ভাতা দেওয়া নিয়ে যত অভিযোগ ও বক্তব্য দু'দিনের শুনানিতে উঠেছে, ১৮ মে'র মধ্যে রাজ্য সরকারকে তার জবাব দেওয়ার জন্য শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল ও বিচারপতি সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। ইতিমধ্যে ইমামদের ওই ভাতা দেওয়া হলে তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে যে, মামলায় রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বাতিল হলে ওই টাকা তাঁদের ফেরত দিতে হবে। ১ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

৯ এপ্রিল রাজ্য সরকার নির্দেশিকা মারফত জানিয়েছিল, ইমামদের মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। ওই টাকা রাজ্য দেবে ওয়াকফ বোর্ডকে। বোর্ড তা ইমামদের হাতে তুলে দেবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্র ছাড়াও সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে ইমামদের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা করা হল বলে সরকার জানিয়েছিল। এই নির্দেশিকা চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবার পর্যন্ত পাঁচটি মামলা হয়েছে। এদিন বি জে পি'র তরফে হওয়া মামলায় আইনজীবী কৌশিক চন্দ বলেন, ইমাম-ভাতা নিয়ে ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছিল।

আদালত বলেছিল, এমন ভাতা দেওয়া উচিত। কিন্তু, তা দেবে ওয়াকফ বোর্ড। ওই বোর্ড বলেছিল, অত টাকা নেই। দেশের শীর্ষ আদালত অল ইন্ডিয়া ইমামস অর্গানাইজেশনের করা মামলায় তখন বলেছিল, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকেই ওই ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য ওই আদালত একটি প্রকল্প করতে বলেছিল। সেই মতো ইমাম ও মোয়াজ্জিমদের জন্য একটি প্রকল্প হয়। যার ভিত্তিতে সরকারি ও নথিভুক্ত মসজিদের ইমামদের যোগ্যতা এবং কাজের সময়ের ভিত্তিতে ভাতা দেওয়া শুরু হয়। পরে আর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ওই প্রকল্প অনুযায়ী কোনও ইমাম ভাতা না পেলে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে পারবেন। এ কথা জানিয়ে ওই আইনজীবী এদিন দাবি করেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশিকার পরিপন্থী।

তিনি আরও বলেন, ইমামদের অবদান হিসাবে রাজ্য সরকার যা বলেছে, তা আদ্যন্ত ভুল। কারণ, ইমামদের কাজ আজান দেওয়া, অন্যদের নমাজ পড়ানো এবং মসজিদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। ধর্মীয় কাজের বাইরে তাঁদের কোনও কাজ করতে হয় না। তাই ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে এভাবে ভাতা দিতে পারে না। যা চরম বৈষম্যমূলক। পরে, রাজ্য সরকারের হয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ওই ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার তার বাজেটে ইতিমধ্যেই ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সংবিধান অনুযায়ী কোনও খাতে বরাদ্দ হওয়া অর্থের ব্যাপারে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ওয়াকফ বোর্ডের তরফে আইনজীবী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহঃ গালিব বলেন, ১৯৯৫ সালে থেকে ৭১ জন ইমামকে এমন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বোর্ডের টাকা থেকেই তা দেওয়া হয়। তাঁরা আরও বলেন, ইতিমধ্যেই সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ১২ জন ইমামকে ভাতা দেওয়া হয়েছে। এই সওয়াল জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এদিন ওই নির্দেশিকা দিয়েছে।

*সৌজন্যে :* বর্তমান, ৫.৫.১২

# মৌলবাদ তোষণ

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতনন্দন বরাবরই স্পষ্টবক্তা। রাজ্য-রাজনীতিতে তাঁহার জনপ্রিয়তার মূলেও তাঁহার এই ঠোঁটকাটা স্বভাব। তাঁহার একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য তাঁহারই নিজের দল সি পি আই এমের নিকট ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার বিড়ম্বনা লইয়া হাজির হইয়াছে। তাঁহার অভিযোগ—কেরলে মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গিরা রাজ্যকে একটি মুসলিম-গরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করিতে অর্থ ও যৌনতা উভয়ই ব্যবহার করিতেছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম বরণে প্ররোচিত করিতে টাকাপয়সার টোপ এবং মুসলিম নারীদের বিবাহ করার প্রলোভন, দুই-ই দেখানো হইয়াছে, যাহার সাহায্যে রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতির হারে বৃদ্ধি করা যায়। অচ্যুতনন্দনের এই অভিযোগে দেশের গোটা বামপন্থী মহলেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এমন কথা বলা তাঁহার উচিত হইয়াছে কি না, তাহা লইয়া তাঁহার দলের মধ্যেই ত্রস্ত জিজ্ঞাসা গুঞ্জরিত হইতেছে।

অভিযোগটি যে গুরুতর, তাহাতে সংশয় নাই। আশা করা যায়, এমন অভিযোগ তোলার আগে তিনি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াছেন, পর্যাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ

করিয়াছেন। তাহা না করিয়া কেবল জনরবের ভিত্তিতে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ তুলিলে পরিণাম মারাত্মক হইতে পারে। কিন্তু অচ্যুতনন্দন কোনও গজদন্তমিনারবাসী তাত্ত্বিক নেতা নহেন, মাটির কাছাকাছি থাকা, ব্যাপক জনসংযোগে অভ্যস্ত রাজনীতিক হিসাবেই তাঁহার পরিচিতি। তিনি যদি অভিযোগটির সত্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হন, তবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করা হইতে নিবৃত্ত থাকাও তাহার উচিত হইত না। বস্তুত, বামপন্থী, বিশেষত মার্ক্সবাদী দলের যে-সকল নেতা অচ্যুতনন্দনের বক্তব্যে বিব্রত বোধ করিতেছেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে বলিতেছেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাত শক্ত করিবে, কেননা হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপি আগেও এমন অভিযোগ করিয়াছে। অনুমান করা যায়, আসলে তাঁহাদের ভয়, ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা আরও বেশি করিয়া বামেদের বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন। বিশেষত তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস অচ্যুতনন্দনের বিবৃতির ব্যাপক প্রচার করিয়া সংখ্যালঘু ভোটারদের আরও বেশি করিয়া বামেদের বিপক্ষে সমাবেশিত করিতে পারে, যাহা বামেদের নির্বাচনী বিপর্যয়কে একপ্রকার অনিবার্য করিয়া তুলিবে।

ইহা সংকীর্ণ চিন্তা। ভোট-রাজনীতির এই সমীকরণ মিলাইতে গিয়াই বিভিন্ন দল এ দেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে সংহত করিয়াছে। সংখ্যালঘুর অধিকাররক্ষা ও কল্যাণসাধনের নামে বাম-দক্ষিণ সব দলই ধর্মীয় মৌলবাদ ও তাহার সহোদর জেহাদি বা জঙ্গি প্রতিক্রিয়ার সংগঠনগুলিকে প্রশ্রয় দিয়াছে। ভারতে আজ যদি ইসলামি সন্ত্রাস বলিয়া কোনও উপদ্রব ধ্বংস ও সংহারে প্রমত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার পিছনে এই ধারাবাহিক প্রশ্রয়ের ভূমিকা কম নহে। সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার স্লোগান যে সব দলের কাছেই স্লোগানের অধিক কিছু থাকে নাই, সাচার কমিটির রিপোর্টই তাহার প্রমাণ। সংখ্যালঘুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের প্রশ্নগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতাদের সহিত মঞ্চ ভাগাভাগি করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে তোষণ করার নির্লজ্জ চেষ্টা হইয়াছে। আম মুসলিম জনতা কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের ইমাম-সংসর্গ বা মৌলবি-সান্নিধ্যে প্রভাবিত হইয়া দলে-দলে ভোট দেন নাই, নিজেদের জীবনযাপনের তিক্ত বঞ্চনা ও প্রতারণার অভিজ্ঞতা হইতেই রায় দিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতেও দিবেন। মাদ্রাসায় জেহাদি মৌলবাদের প্রশিক্ষণ চলিলে সরকারকে তাহা বন্ধ করিতেই হইবে। সংখ্যালঘু ভোট কমার ভয়ে এ বিষয়ে বিবৃতি প্রত্যাহারের পশ্চাদপসরণ মৌলবাদকে তোষণের নামান্তর।

*সৌজন্যে : আনন্দবাজার, ২৭ জুলাই, ২০১০*

# ফুরফুরায় মুসলিমদের জন্য একগুচ্ছ 'তোফা' ঘোষণা মমতার

**বি এন এ:** ভোট ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে ফের মুসলিমদের জন্য একগোছা 'তোফা' ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, রাজ্যে লাগামছাড়া বেকার সমস্যার হাল শক্ত হাতে ধরতে না পারায় বসে থাকা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ব্যবসায় নামার কথা বললেন তিনি। বৃহস্পতিবার জাঙ্গিপাড়ার ফুরফুরা শরিফে একগুচ্ছ প্রকল্পের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে এক কোটি বেকার। দীর্ঘদিন চাকরি হয়নি। চাকরি না পেলে

কোনওভাবেই হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। আত্মহত্যাও করবেন না। এক জায়গায় চাকরি না পেলে অন্য জায়গায় আবেদন করুন। প্রয়োজনে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ছোটখাট ব্যবসা করুন। কঠোর পরিশ্রম করুন। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। ব্যবসার জন্য সরকার থেকে ঋণও দেওয়া হচ্ছে।

এদিন ফুরফুরা শরিফে মুখ্যমন্ত্রী দুটি মুশাফিরখানা, গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প, আই টি আই কলেজ, গার্লস হস্টেল এবং ফুরফুরা মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের উন্নয়নের শিলান্যাস করেন। এছাড়াও, তিনি পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন, মাধ্যমিক পূর্ব ও পরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও গীতাঞ্জলি আবাস যোজনায় কয়েকজন সুবিধাভোগীদের শংসাপত্র প্রদান করেন। ফুরফুরা শরিফে পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্নানাগার ও শৌচালয় তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কৃষি বিপণনমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা তত্থা সিদ্দিকি, বিধায়ক তথা হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, হুগলির জেলাশাসক শ্রীপ্রিয়া রঙ্গরাজনসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে এদিনের অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। সবমিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান কার্যত জনসভার চেহারা নেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলাম পাঁচ বছরে দু'লক্ষ চাকরি দেব। এই এক বছরেই ছ'লক্ষ বেকারের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সরকারিতে তিন লক্ষ এবং বেসরকারিতে তিন লক্ষ। রেলমন্ত্রী থাকার সময় এ রাজ্যে ১৬টি রেল কারখানা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আরও কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, আসলে বেকার সংখ্যাটা অনেক। তিনি এক উদাহরণ টেনে বলেন, কলকাতা পুলিশ ২০০০ লোক নেওয়া হবে। আমি পুলিশের এক কর্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কত আবেদন জমা পড়েছে? উনি বললেন, দু'লক্ষ। তাহলেই ভাবুন। আমি চাহিদাটা দেখার জন্যই আবেদনের সংখ্যাটা জানতে চেয়েছিলাম। ডানকুনি থেকে ফুরফুরা শরিফ পর্যন্ত রেলপথের কাজ যাতে দ্রুত হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এদিন সহযোগিতার আবেদন করেন। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ প্রসঙ্গে বলেন, আমি রেলমন্ত্রী থাকার সময় উদ্যোগ নিয়েছিলাম। প্রায় ১০ বছর হয়ে গেলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে, আগামী ৪ জুন তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ পর্যন্ত ট্রেন চলবে। ডানকুনিতে দুটি রেলের কারখানা হচ্ছে। আগামী ৮-১০ দিনের মধ্যে একটি কারখানার উদ্বোধন হবে। তিনি বলেন, আমরা এখন দেনাতে চলছি। অই মাদ্রাসাদের বলছি, টাকা দিতে না পারলেও আমরা আইনি স্বীকৃতি দেব। আর আইনি স্বীকৃতি পেলেই অনেক জায়গা থেকে টাকা পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, রাজ্যের সব জেলায় মুসলিমদের জন্য সংখ্যালঘু ভবন তৈরি হবে। সংখ্যালঘুদের জন্য আগের এক বছরে কমরেড সরকার মাত্র তিন লক্ষ জনকে ঋণ ও স্টাইপেন্ড দিতে পেরেছিল। আমরা এই এক বছরেই ১৭ লক্ষ মানুষকে ঋণ ও স্টাইপেন্ড দিয়েছি। আমাদের উপর বিশ্বাস আর ভরসা রাখুন। সি পি এমের দেনার দায়ে আমরা বিকিয়ে আছি। তবে, দেনাকে অতিক্রম করে এই বাংলায় সোনা ফলাব।

*সৌজন্যে : বর্তমান, ১৮ মে, ২০১২*

# কিভাবে ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে : একটি বিশ্লেষণ

ডঃ সুব্রামনিয়ম স্বামী

(১৬ জুলাই, ১৯১১ শনিবার প্রকাশিত/মুম্বাই/এজেন্সি: ডি এন এ)

মুম্বাইতে ১৩ই জুলাই ১৯১১-র বিস্ফোরনের পর ভারতের হিন্দুদের সুনির্দিষ্ট আত্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা কখনই এইরূপ ভয়ঙ্করভাবে খুন হওয়া বরদাস্ত করতে পারে না। দেশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রমাগত রক্তপাত অসহ্য। আমার মতে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে অবৈধভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের ইচ্ছে ও সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের বিরুদ্ধে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ভারতের জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক নম্বর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ২০১২-র পরে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকবে না। তার মধ্যে আমার মনে হয় পাকিস্তান তালিবান খপ্পরে চলে যাবে এবং আমেরিকানরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। তারপর ইসলাম তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। ইতিমধ্যেই ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরী আল কায়দার নেতা ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা নয় ভারতই তার সংগঠনের আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

ধর্মান্ধ মুসলমানরা হিন্দু প্রধান ভারতকে 'ইসলামের বিজয়ের অসমাপ্ত অধ্যায়' বলে মনে করে। ইসলামের দ্বারা বিজিত অন্য সমস্ত দেশ ইসলামী আগ্রাসনের দু-দশকের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু ৮০০ বছরের নৃশংস ইসলামী শাসনের পরেও ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতে হিন্দু সংখ্যা ছিল ৭৫ শতাংশ। এটাই ধর্মান্ধদের মাথাব্যাথার কারণ।

এক অর্থে মুসলমান ধর্মান্ধদের হিন্দুদের আক্রমণ করাকে আমি দোষ দেই না। আমি সেই হিন্দুদের দোষ দেই যারা সনাতন ধর্ম চূড়ান্ত অনুসরণে নিজেকে একাকী করে নেয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু, রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ স্ব-ঘোষিত ভাবে কুম্ভ মেলায় জমায়েত হয়। কিন্তু তারাই কাশ্মীর, মাউ, মেলভিশরম এবং মালাপ্পুরমে হিন্দুদের আক্রমণের মুখে পড়তে দেখেও বাড়ির পথ ধরে, অথচ হিন্দুদের সংগঠিত করতে বজ্রমুষ্ঠি তুলে ধরে না। যদি অর্ধেক হিন্দু জাতপাত ও ভাষার উর্দ্ধে উঠে একটা খাঁটি হিন্দু দলকে ভোট দিত তাহলে সংসদ ও বিধানসভায় তাদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত।

ভারতের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করতে প্রথম শিক্ষা থেকে যেটা জানা যায় তাহল হিন্দুরা হচ্ছে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। মুসলমানরা ক্রমশঃ আরো মৌলবাদী হবার প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমণে এগিয়ে আসছে। হিন্দু মননকে দুর্বল করতে এবং গৃহযুদ্ধের ভীতি তৈরি করার জন্যই এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণগুলি সংগঠিত করা হচ্ছে।

হিন্দুদের অবশ্যই সংঘবদ্ধভাবে এর প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং ব্যক্তি হিসাবে একা একা ভাবলে হবে না। কেউ যদি এটা ভেবে সন্তুষ্ট থাকেন যে আমারতো কিছু হয়নি, তবে সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ। যদি শুধু হিন্দু হবার জন্যই একজন হিন্দুর মৃত্যু হয়, তবে হিন্দু সমাজের প্রত্যেকেরই একটু হলেও মৃত্যু হয়। বিরাট (একনিষ্ঠ) হিন্দু সমাজের এই মানসিকতাই অত্যন্ত জরুরী।

ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হিন্দু সংঘবদ্ধ চেতনাই আজ আমাদের দরকার। ভারতের মুসলমানরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে যদি তারা সত্যিই হিন্দুদের জন্য অনুভূতিশীল হন। কিন্তু যতক্ষণ না তারা মুসলমান হলেও তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছে, তাদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। যদি কোন মুসলমান তার হিন্দু উত্তরাধিকার স্বীকার করে তবে তাকে বৃহৎ হিন্দু সমাজ বা হিন্দুস্তানের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। হিন্দু এবং যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু তাদের নিয়েই ইন্ডিয়া তথা ভারত তথা হিন্দুস্তান জাতি গঠিত। অন্য যারা এটা অস্বীকার করে অথবা বিদেশীরা যারা নথিভুক্তির মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন তারা ভারতে থাকতে পারেন কিন্তু তাদের ভোটাধিকার থাকা বা জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার থাকা উচিত নয়।

প্রতিটি হিন্দুকে একনিষ্ঠ হিন্দু হবার মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া আবশ্যিক। এর জন্য প্রত্যেকের হিন্দু চেতনা থাকা দরকার এবং 'ব্যক্তিগত চরিত্র' এবং 'রাষ্ট্রীয় চরিত্র' গঠন অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, মনমোহন সিং উচ্চ ব্যক্তিগত চরিত্রের অধিকারী, কিন্তু সোনিয়া গান্ধীর রাবার স্ট্যাম্প হওয়ায় এবং প্রতিটি জাতীয় বিষয়ে দুর্বল অবস্থানের জন্য একটা প্রমাণিত যে তার কোন রাষ্ট্রীয় চরিত্র নেই।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য দ্বিতীয় শিক্ষা হল যে আমরা কখনই ওদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করব না। ১৯৮৯ সালে মুফতি মহম্মদ সইদের মেয়ে রুবাইয়াকে ছাড়ানোর জন্য ৫ জন জঙ্গীকে মুক্ত করা এবং ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আই সি-৮১৪ কে ছিনতাই করলে ৩ জন জঙ্গীকে মুক্ত করা ভুল হয়েছিল।

তৃতীয় শিক্ষা হল যে, যেখানে যত ছোট সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হোক না কেন সমগ্র জাতিকে একসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে, যেমন, যখন অযোধ্যা মন্দির আক্রমণ করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে প্রতি আক্রমণ করে সেখানে রামমন্দির গড়ে তোলা উচিত ছিল।

তথাকথিত উদারপন্থীদের মতে সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণ অশিক্ষা, দারিদ্র, নিপীড়ন এবং বৈষম্য। তারা সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করার বদলে এই চারটি মূল বিষয়কে দূরা করার কথা বলেন। এটা একটা বস্তাপচা ধারণা। কারণ ওসামা বিন লাদেন ছিলেন কোটিপতি। টাইমস স্কোয়ারের ব্যর্থ আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসবাদী শাহজাদ ছিল পাকিস্তানের উচ্চবংশীয় পরিবারের ছেলে এবং আমেরিকার প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি এ করা।

এটা একটা উদ্ভট ধারণা যে, সন্ত্রাসবাদীদের রোখা যাবে না কারণ তারা যুক্তিহীন এবং মরতে ইচ্ছুক। সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে এবং তাদের খ্যাপামির একটা পদ্ধতি আছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের কার্যকরী কৌশল হল তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে পরাস্ত করা এবং প্রতি আক্রমণের দ্বারা সন্ত্রাসবাদ শেষ করা। ভারতে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে এবং তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে পরাস্ত করতে নিম্নলিখিত রণকৌশল নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

**লক্ষ্য ১ :** ভারতকে কাশ্মীর নিয়ে ভয় দেখাও।

**কৌশল :** সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করতে হবে এবং প্রাক্তন সেনাদের কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করে দিতে হবে। হিন্দু পণ্ডিতদের জন্য পানুন কাশ্মীর তৈরি করতে হবে। সুযোগ

ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে হবে। যদি পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে যেতে থাকে তবে বালুচি ও সিন্ধীদের স্বাধীন করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

**লক্ষ্য ২ :** মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটাও, হিন্দু ভক্তদের হত্যা কর।

**কৌশল :** কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে মসজিদ হঠাতে হবে ৩০০ হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরি মসজিদ হঠাতে হবে।

**লক্ষ্য ৩ :** ভারতকে দার-উল-ইসলাম বানাও।

**কৌশল :** অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে হবে, সংস্কৃত শিক্ষা ও বন্দেমাতরম্ গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হোক। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হোক এবং অহিন্দুদের ভোটদানের অধিকার দেয়া হোক যদি তারা গর্বের সাথে তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা স্বীকার করে। হিন্দু এবং যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু তাদের দেশ হিসাবে ভারতের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্তান রাখা হোক।

**লক্ষ্য ৪ :** অবৈধ অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা না করে ভারতের জনবৈশিষ্ট্য পাল্টে ফেল।

**কৌশল :** হিন্দু থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরকরণ বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। পুনঃধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ হবে না। এটা ঘোষণা করতে হবে যে জন্মের ভিত্তিতে নয় নীতি ও কাজের ভিত্তিতে জাত সৃষ্টি হয়। অহিন্দুদের তাদের পছন্দমত জাতে পুনঃধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দিতে হবে, যদি তারা নীতি ও কাজের বিষয়টি মেনে নেয়। ভারতে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অনুপাতে বাংলাদেশ থেকে জমি দখল করতে হবে। বর্তমানে সিলেট থেকে খুলনা পর্যন্ত বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসনের জন্য নেওয়া যেতে পারে।

**লক্ষ্য ৫ :** কুরুচিকর লেখা এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও গীর্জা থেকে ক্রমাগত প্রচার করে হিন্দুত্বকে নীচে দেখাও। এর দ্বারা হিন্দুদের স্বাভিমান ধ্বংস করে তাদের বশ্যতা স্বীকারের পর্যায়ে নিয়ে যাও।

**কৌশল :** হিন্দু স্বাভিমান গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

এইরূপ সুনির্দিষ্ট কৌশলে ভারত ৫ বছরের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সমস্যার সমাধান করতে পারবে যদি উপরে উল্লিখিত চারটি শিক্ষা অনুযায়ী এগোতে পারে। ভারতকে বাঁচানোর জন্য হিন্দু স্বাভিমানের ভিত্তিতে সাহসী, ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরী। যদি ইহুদীরা গ্যাস চেম্বারে হেটে যাওয়া ভীত ভেড়ার থেকে মাত্র দশ বছরে তেজস্বী সিংহে রূপান্তরিত হতে পারে তবে ৫ বছরে হিন্দুদের পক্ষে এটা করা কোন কঠিন কাজ নয়। মনে রাখবেন এখনও আমরা ৮৩%।

গুরু গোবিন্দ সিং দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে মাত্র ৫ জন অকুতোভয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় একটা সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। এমনকি অর্ধেক হিন্দুও যদি সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুর সমস্যা সমাধানে একনিষ্ঠ কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় তাহলে আমরা পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে সক্ষম হব। গণতান্ত্রিক হিন্দুস্তানকে সন্ত্রাসবাদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এই রণকৌশলই বর্তমানে চূড়ান্ত কর্তব্য।

*(লেখক জনতা পার্টির সভাপতি, পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অর্থনীতির অধ্যাপক)*

**ইসলাম সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি ঃ**

১) "যদি কেউ যুক্তির ধার না ধারে তবে সুবিচার পাওয়া যায় না। এটা ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি। কোন ধর্ম অত্যন্ত ভয়ানক নির্দেশ প্রদান করে। যেমন, ইসলাম মুসলমানদের তাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সবাইকে হত্যা করা নির্দেশ দেয়। কোরানে এটা পরিস্কার বলা আছে, 'অবিশ্বাসীদের খুন কর যদি তারা মুসলমান না হয়।' তাদের আগুন ও তরবারির দ্বারা হত্যা কর।"

*—স্বামী বিবেকানন্দ (প্র্যাকটিকাল বেদান্ত, পৃষ্ঠা ৭২,*
*অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত, ২০০২)*

২) "যে ঈশ্বর (আল্লা) নিজের ধর্মের লোকদের পক্ষপাতিত্ব করে মানুষ বলে এবং অন্যদের নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণ্য পশু বলে গণ্য করে, সে একজন শয়তানের থেকেও অধম। এইরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করার থেকে বরং আমি একশো বার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। আমি সারা জীবন এই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

*—স্বামী বিবেকানন্দ। (প্র্যাকটিকাল বেদান্ত, পৃষ্ঠা ১৫,*
*অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত, ২০০২)*

৩) "কোরান ও ইসলামের তরবারি মানবসভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে বড় শত্রু, যা আজ পর্যন্ত মানুষ দেখেছে।"

*—স্যার উইলিয়াম ম্যুর। (দ্য লাইফ অফ মহম্মদ, পৃষ্ঠা ৫২২,*
*ভয়েস অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী ১৯৯২)*

৪) "ইসলাম কোন ধর্ম নয়, ইসলাম হচ্ছে আরব সাম্রাজ্যবাদ।"

*—আনোয়ার শেখ। (ইসলাম-আরব সাম্রাজ্যবাদ, পৃষ্ঠা ৫,*
*Also see www.faithfreedom.org)*

# হিন্দু বিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র

রাজ্যে ত্রিশ হাজার ইমামকে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে ২৪শে এপ্রিল কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে মেট্রো চ্যানেল অথবা রাণী রাসমণি রোড পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি জমা দেবে। সেইমত অনুমতি প্রার্থনা করে লালবাজারে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর)-এর দপ্তরে দরখাস্ত জমা দিতে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর দপ্তর থেকে প্রথমে বলা হল যে ২৪ তারিখে অন্যদের কর্মসূচী আছে, তাই ওইদিন অনুমতি দেওয়া যাবে না। তখন আবার ২৫ এপ্রিলের জন্য নতুন করে দরখাস্ত লিখে নিয়ে যাওয়া হল। লালবাজারে কয়েকবার উপর-নীচ করার পর যুগ্ম কমিশনার (সদর)-এর পি. এ. পরিষ্কার বলে দিলেন যে হিন্দু সংহতির কোন দরখাস্তই গ্রহণ করা হবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে এটাই

যুগ্ম কমিশনার জাভেদ শামিম্-এর নির্দেশ। তাই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তখন হিন্দু-সংহতির কর্মকর্তারা জাভেদ শামিম-এর সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলেন। কিন্তু তাঁর পি. এ. অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন না এবং লালবাজারের ও. সি.র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই অফিসার অর্থাৎ ও. সি. সংহতি কর্মকর্তাদেরকে কোনভাবেই যুগ্ম কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার সময় দিলেন না। ফলে হিন্দু সংহতির দরখাস্তই তাঁরা জমা নিলেন না।

এই একই ইস্যুতে লালবাজার বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে কলকাতায় সভা ও মিছিল করার অনুমতি দিয়েছে। আরও দেখা গেল যে, জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতির কোন প্রকাশ্য সভা সমাবেশ করারই অনুমতি প্রশাসন দিচ্ছে না। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দু সংহতিকে কার্যকলাপ করতে না দেওয়া শুধু লালবাজারের চক্রান্ত নয়। কারণ জেলা পুলিশ লালবাজারের অথবা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের অধীনে পড়ে না। সেগুলি রাজ্য পুলিশের অধীনে। এবং রাজ্য পুলিশ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর মমতা ব্যানার্জীর অধীনে। সুতরাং, হিন্দু সংহতিকে আটকে রাখা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করতে না দেওয়ার কাজটি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই করছেন, আর কেউ নয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু সংহতির মত একটি ক্ষুদ্র সংগঠনকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা বিপুল ভোটে ক্ষমতায় বসা মমতাদেবী কেন করছেন? কয়েকমাস আগেও এর উত্তরটা দেওয়া হয়ত একটু কঠিন ছিল। এখন এর উত্তরটা বোঝা আর কঠিন নয়। উত্তর একাধিক। প্রথমতঃ, ইতিমধ্যে রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকাবের প্রধান কাজই হল মুসলিম তোষণ করা। ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিন ভাতা, দশ হাজার মাদ্রাসাকে স্বীকৃতিদান, উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা ঘোষণা, ওবিসি সংরক্ষিত চাকুরির প্রায় সবটাই মুসলিমের হাতে তুলে দেওয়া, মুসলিম ছাত্রদের জন্য ঢালাও বৃত্তি দেওয়া, মুসলিম ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত যেখানে আরবি ভাষা ও ইসলামিক ইতিহাস পড়া বাধ্যতামূলক, রাজারহাটে কুড়িতলা হজ মঞ্জিল করার সিদ্ধান্ত। এসব দেখে রাজ্যবসীর মনে হচ্ছে যে এই সরকার শুধু মুসলমানের কাজ করার জন্যই তৈরি হয়েছে। শুধ তাই নয়, ৩রা এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরকার আয়োজিত ইমাম সভায় কয়েকজন বক্তা ইমাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মুসলিম দেশেও মুসলমানদের জন্য যা করা হয় না, এমনকি সৌদি আরবেও সরকার মুসলমানদের জন্য যা করেনি, এখানে দিদির সরকার তা করেছে। এর পূর্বে কলকাতার রেড রোডে ঈদের জমায়েতে তাবড় ইমামরা মমতা ব্যানার্জীকে ধমক ও হুমকি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সরকারের এই সব পদক্ষেপ। মমতাদেবীর এখন প্রধান পরামর্শদাতা ইমাম বরকাতি, ত্বহা সিদ্দিকী ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। হিন্দু সংহতি অতি ক্ষুদ্র সংগঠন হলেও বহু জেলায় হিন্দুদের ধর্ম, সম্পত্তি ও আত্মসম্মান রক্ষায় এই সংগঠন একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুরা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির কাছ থেকে মমতার উপর চাপ এসেছে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। এই কারণেই ১৪ ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জনসভাকে বানচাল করতে পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া। এই হচ্ছে প্রথম কারণ।

আরও একটি কারণ আছে। ইতিমধ্যেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে পরিবর্তনের পর

শাসক মমতা স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন। বিন্দুমাত্র বিরোধিতা এবং অন্যের তিলমাত্র প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারেন না। পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ, দময়ন্তী সেন, কাটোয়া ধর্ষণ, রেলমন্ত্রী দীনেশ গোস্বামীর অপসারণ প্রভৃতি বহু ঘটনা তার প্রমাণ। তাই হিন্দু সংহতির উত্থান ও জনপ্রিয়তা তাঁর চক্ষুশূল হয়েছে। তাঁর ইঙ্গিতে তাঁকে খুশি করতে হিন্দু সংহতির বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসন আইন মানছে না, কোর্টের আদেশ মানছে না ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত বেদনার কথা যে রাজ্যের বহু সিনিয়র আই. সি. এস., আই. পি.এস. অফিসারও মমতা ব্যানার্জীর স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছেন না। আর রাজ্যের অভিজ্ঞ ও সিনিয়র মন্ত্রীদের অবস্থা দেখলে করুণা হয়।

এর ফল রাজ্যের জন্য তো ভয়াবহ হচ্ছেই। এছাড়া আরও একটি বিপজ্জনক পরিণাম হতে পারে। হিন্দু সংহতিকে যখন প্রকাশ্য ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচী পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন হিন্দু যুবকদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে, এবং তার ফলে হিন্দু যুবকরা হিন্দু সংহতির শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অতি আস্থা হারিয়ে ফেলে গুপ্ত কার্যকলাপ ও উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। হিন্দু যুবকদেরকে এইভাবে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া—এটা হয়ত কোন একটি লবির গভীর চক্রান্ত হতে পারে। 'ইসলামিক জঙ্গী গোষ্ঠী' আজ সারা পৃথিবীতে একটি অতি প্রচলিত শব্দ। এর ফলে সার্বিকভাবে ইসলামের বদনাম হয়। সেই বদনামের ভাগীদার অন্যদেরও করতে পারলে তাদের বদনামের বোঝাটা খানিকটা হালকা হয়। তাই হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বা হিন্দু জঙ্গী গোষ্ঠী নির্মাণের পিছনে কোন গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তা অনুধাবন করতে না পেরে মমতাদেবী হয়ত সেই ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছেন। হিন্দু সংহতির কর্মী সদস্যরা যেন সেই চক্রান্তের শিকার হয়ে ভুল করে না বসে—সে বিষয়ে তাদের সাবধান থাকতে হবে।

*সৌজন্যে : স্বদেশ সংহতি সংবাদ, মে, ২০১২*

## শ্বেতাঙ্গ নারীর সহজ মাংস ভক্ষণ : পাক ধর্ষণকারীচক্রের জেল

কোলকাতা, ইংরাজি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ১০ মে'য়ে ২০১২ খবর অনুযায়ী ব্রিটিশ নাবালিকা ধর্ষণের চক্র ধরা পরেছে। ৯ জন এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। এদের মধ্যে আটজন পাকিস্তানী ও আর একজন আফগানী। এদের নাম হল আব্দুল রৌফ, হামিদ সাফি, মহম্মদ সাজিদ, আব্দুল আজিজ, আব্দুল কাইউম, আদিল খান, মহম্মদ আমিন, কবীর হাসান, আর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ দলের মূল পাণ্ডার বয়স ৫৯ বছর।

এই চক্রের সকলকেই ১৯ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ আদালতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই চক্রের মূল কাজ হল নাবালিকা ধর্ষণ। তারা ধর্ষণ করেছে মোট ৬৩১ জন নাবালিকাকে বিগত পাঁচ বছরে এবং দশ মাসের মধ্যে ১৮৭ জনকে। ধর্ষিতাদের, গড় বয়স ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। এই দলের পাণ্ডারা মিলিতভাবে কখনও ট্র্যাক্সী ড্রাইভার সেজে, কখনও ক্লাব থেকে, যুবকেন্দ্র থেকে, পানশালা থেকে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, ঘাবরে মাদক মিশিয়ে গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করত।

ব্রিটিশ বিচারপতি গ্রিল্ড ক্লিফটন অভিযুক্তকারীদের বলেছেন, 'তোমরা ধর্ষণ করেছ ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ নাবালিকাদের। কারণ তারা তোমাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে।' কারাদণ্ডে দণ্ডিত আব্দুল রৌফ, বয়স বিয়াল্লিশ বছর, পাঁচ সন্তানের পিতা এবং সে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে বেড়ায়।

জ্যাক স্ট্র, প্রাক্তন ব্রিটিশ বিদেশ সচিব দুঃখ করে বলেছেন, 'আমাদের দেশের একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ নাবালিকাদের ধর্ষণের ঘটনা। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের মধ্যে বেশিরভাগই পাকিস্তানী বংশদ্ভূত মুসলিম।'

ইংলিশ ডিফেন্স লীগ ও নতুন ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল 'ব্রিটিশ ফ্রিডম পার্টি' বহিরাগত মুসলিম পুরুষের দ্বারা ব্রিটিশ নাবালিকাদের উপর ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের ঘটনার জন্য প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের ভুল অভিবাসন নীতির ফল আজ ব্রিটিশ সমাজকে ভুগতে হচ্ছে। ব্রিটেনে অপরাধের ঘটনায় বেশির ভাগ মুসলিম পুরুষরা জড়িত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই পাকিস্তানের বংশদ্ভূত নাগরিক।

ব্রিটিশ মহিলাদের মতে আমাদের আগে এরকম কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি, এখন প্রায়ই একদল মুসলিম যুবক কখনও ইস্কুলের সামনে, কখনও লোকাল রেল স্টেশনের সামনে মেয়েদের পিছনে লাগে। বিশেষ করে ১১ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের। এটা আমাদের কাছে খুব বিপজ্জনক ও চিন্তার বিষয়।

শুধু ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে বিশেষ করে নরওয়ে, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, বেলজিয়ামে শ্বেতাঙ্গ নারীদের ধর্ষণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বহিরাগত মুসলিম পুরুষের দ্বারা। এসবই দেশের ভুল অভিবাসন নীতির ফল। যা আজ গোটা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নারীদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে।

ইউরোপের একটি দেশ নরওয়ে। নরওয়ের পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের দেশের মেয়েদের ধর্ষণ করছে বহিরাগত মুসলিম পুরুষ।

পৃথিবীর মানব উন্নয়নকারী দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থানে অবস্থানকারী নরওয়ের মহিলাদের আগে এরকম বিপদের মুখে পড়তে হয়নি।

নরওয়ের মহিলা চিকিৎসক খ্রিশ্চিয়ান স্পীটজিঙ্গলে লেছেন, 'মুসলিম পুরুষেরা শুধু নরওয়ের অমুসলিম মহিলাদের শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। তারা যখন দেখে তাদের ধর্মের মেয়েরা হিজাব ও বোরখা পরে রাস্তায়, বের হয় তারা তাদেরকে উত্যক্ত করে না। তারা শুধু আমাদেরকেই আক্রমণ করে।'

নরওয়ের 'ALARM—সংস্কৃতির ধ্বস' বইয়ের লেখিকা হোনি হেরল্যান্ড পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা নরওয়ের মানুষ মুসলিমদের এই দেশে আসতে দিয়েছি শিক্ষা, উন্নত জীবন ও রুজির জন্য। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে ঘৃণা ও ধ্বংস করতে চায় এবং সেই চেষ্টা তারা করছে। তারা এই দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চায়। এই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি তাদের কোনও ভালোবাসা নেই। যার ফল আজ আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। সময় থাকতে আজই আমাদের এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তা নাহলে এই দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি নারী স্বাধীনতা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

# মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমীপেষু

মাননীয়া মহাশয়া,

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে পরিবর্তন আনার জন্য আপনাকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন। সেই সঙ্গে এই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের কিছু আশঙ্কার কথা আপনার নিকট সুবিবেচনার জন্য পেশ করছি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরিতে ১০% সংরক্ষণ ঘোষণা করে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বেআইনী। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থীদের অবস্থানও ছিল তাই। কিন্তু ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হবার পরে বামফ্রন্ট বেপরোয়া হয়ে যায়। অনগ্রসর জাতি বা ওবিসি সংরক্ষণের নামে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণে নেমে পড়ে। উদ্দেশ্য ছিল বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান ভোটকে নিজেদের পক্ষে টেনে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটল?

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ দেখল রাতারাতি মুসলমানদের মধ্যে ওবিসি জাত গজিয়ে সরকারী আদেশনামা জারী হয়ে গেল। যদিও মুসলমানরা ও তাদের তাবেদার বুদ্ধিজীবীরা দাবি করে যে মুসলমানদের মধ্যে কোনও জাতপাত নেই। শুধুমাত্র একটা এফিডেভিট করে নিজের জাত ঘোষণা করলেই মুসলমানরা ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে। বিশেষ ক্যাম্প করে তাড়াতাড়ি বিলি করারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অথচ একজন হিন্দুকে ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে গেলে জুতোর সুকতলা ক্ষইয়ে ফেলতে হয়। হিন্দুরা যেন ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

এছাড়া বিগত ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট একপেশে মুসলমান তোষণ নীতি নিয়ে চলছিল। যার মধ্যে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল ঃ

১) বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলমান অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেয় এবং বেআইনীভাবে রেশনকার্ড পাইয়ে দেয়া। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী আছে। কিন্তু ভোটের লোভে বাম নেতারা তা গ্রাহ্য করেননি।

২) পাঠ্যপুস্তক থেকে গণেশবন্দনা তুলে দেয়া হয়। অপরদিকে মহম্মদ এবং সাম্প্রদায়িক তীতুমীরের কাহিনী পাঠ্যপুস্তকে ঢোকানো হয়।

৩) মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে সার্কুলার দিয়ে (বিজ্ঞপ্তি নং সিল/৮৫/১ তারিখ ৪.৩.১৯৮৫) ইসলামের কালো ইতিহাস চুনকাম করে ইতিহাস বই লেখার ফতোয়া জারী করা হয়।

৪) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করলে বামফ্রন্টের প্রশাসন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে হিন্দুদের দমন করতে এগিয়ে যায়। গ্রাম শহরে হিন্দুদের এটা খুব সাধারণ অভিজ্ঞতা।

৫) ২০১০ থেকে ৬, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় কয়েক হাজার হিন্দু পরিবারের উপর মুসলমানরা ব্যাপক অত্যাচার করে। বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ, হিন্দুদেব সম্পত্তি লুঠ ও আগুন লাগানো হয়। দেগঙ্গা বাজারে সব হিন্দুদের দোকান লুঠ করে পুড়িয়ে দেয়া হয়, কিন্তু কোন মুসলমানের দোকান আক্রান্ত হয়নি। কয়েক কোটি টাকার হিন্দু সম্পত্তি লুঠ হয়। পুলিশ ও মিলিটারী নামলেও তাদের মুসলমান দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে

নির্দেশ দেয়া হয়নি। ঘটনাটি সরকারের তরফে সেন্সার করা হয়। কিন্তু টেলিফোন, ইন্টারনেট ও কিছু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের মাধ্যমে খবরটি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ও হিন্দুমানসে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দীর্ঘদিন ধরে এইসব ঘটনার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে জমা হচ্ছিল তীব্র ক্ষোভ। বিধানসভা নির্বাচনে তাদের এক বিরাট অংশ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে যায়।

আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা এসেছে। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ঘৃণ্য তোষণবাদী সাম্প্রদায়িক নীতি নিয়ে যে ভুল করেছিল আশা করি আপনি তার পরিবর্তন করবেন।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাশীল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষকে ভীষণভাবে ভাবাচ্ছে। তা হল পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক আক্রমণ বা Demographic Aggression। ১৯৫১ সালে এ রাজ্যে মুসলমান ছিল ১৯% এবং হিন্দু ছিল ৮০%। কিন্তু মাত্র ৬০ বছরে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে বর্তমানে মুসলমান হয়ে গেছে প্রায় ৩০% এবং হিন্দু কমতে কমতে হয়ে গেছে ৬৯%। এক শতাংশ জনগোষ্ঠীগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া এক মারাত্মক ব্যাপার। সেখানে কিনা ভারসাম্য পাল্টে গেছে ১১%। পরিস্থিতিটা ভয়ঙ্কর। বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এরকম চলতে থাকলে আর প্রায় ৪০ বছর পরে অর্থাৎ ২০৫১ সালে এই বাংলায় হিন্দু হয়ে যাবে সংখ্যালঘু।

ইতিহাসের শিক্ষায় আমরা জানি, মুসলমানরা যখন সংখ্যায় বেশি হয়ে ওঠে তখন কোরান-হাদিসে বর্ণিত মুশরিক বা কাফের হিন্দুদের খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন নামক জেহাদের মাধ্যমে ধ্বংস করে দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। একদা গান্ধারীব দেশ আফগানিস্তান এই প্রক্রিয়ায় আজ হিন্দুশূন্য। সেখানে চলছে তালিবানি-শরিয়তি রাজ, যেখানে মেয়েদের স্কুল পুড়িয়ে দেয়া, হিন্দু শিখদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে জিজিয়া কর বসানো, আধুনিক শিক্ষার বদলে মাদ্রাসায় মধ্যযুগীয় বর্বরতার চর্চা করা এখন নিত্যকার ব্যাপার। পবিত্র স্থান বা পাকিস্তান তো আজ ক্যানসারে আক্রান্ত। সেখানে হিন্দু আজ মাত্র এক শতাংশ নেমে এসেছে। বাংলাদেশেও ১৯৪১ সালে হিন্দু ছিল ৩০%। কিন্তু বর্তমানে কমে হয়েছে মাত্র ৯%।

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে মুসলমান জঙ্গী আক্রমণের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু বলেছিলেন, মাদ্রাসায় মুসলমান জঙ্গী তৈরি হচ্ছে। পরে পার্টির চাপে তিনি সেকথা বেমালুম অস্বীকার করেন। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা যে বেআইনী সেটা তিটি বুঝেছিলেন, কিন্তু ভোট-রাজনীতির জন্য সত্যি কথাটা বলতে পারেননি।

সৌদি আরব, ইরান, মালদ্বীপ সহ বিভিন্ন মুসলমান প্রধান দেশে শরিয়তি আইন প্রচলিত। সেখানে সংখ্যালঘু অমুসলমানদের কোনও নাগরিক অধিকার নেই। তারা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত। এইসব দেশে হিন্দু-শিখ কোনও মন্দির-গুরুদ্বার তৈরি করতে পারেনা। কারণ সরকারীভাবে এসব নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

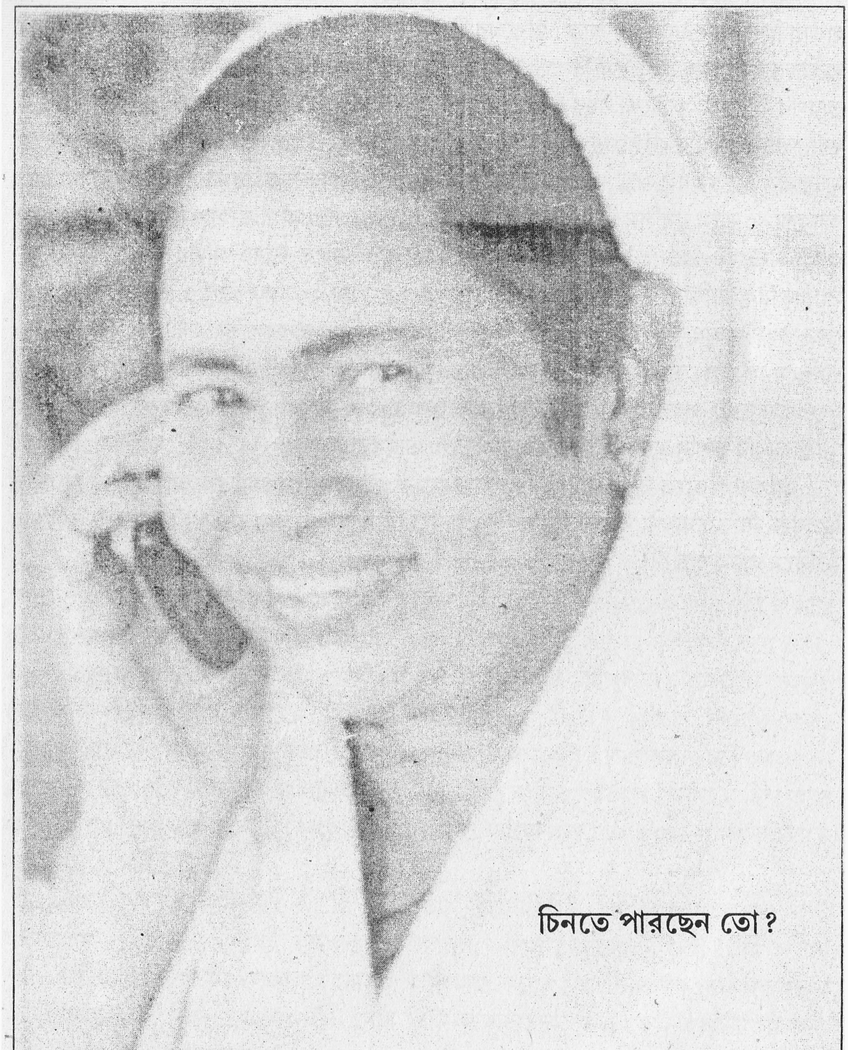
পশ্চিমবঙ্গ কি সেইদিকে এগোচ্ছে? প্রখ্যাত লেখক আনোয়ার শেখ এবং আলি সিনা বলেছেন, ইসলামের শরিয়তি আজ ফ্যাসীবাদের থেকেও ভয়ঙ্কর। এর কাছে গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ,

ধর্মনিরপেক্ষতা নির্মমভাবে কচুকাটা হবে। মুসলমান গরিষ্ঠতা মানে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি।

মহম্মদ-বিন-কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে রাজা দাহির সহ হাজার হাজার হিন্দু নরনারীকে খুন করে। দেবলের বিখ্যাত মন্দির থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি লুঠ করে এবং নারীদের ধর্ষণ করে ক্রীতদাসী হিসাবে দেশে নিয়ে যায়। তখন ভারতে মুসলমান ছিল শূন্য শতাংশ। তারপর ভারতের আটশো বছর সংখ্যালঘু মুসলমান শাসনে হিন্দুরা ছিল পরাধীন। হিন্দুদের খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে বাড়তে থাকে মুসলমান সংখ্যা। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৪৭ সালে মুসলমান বেড়ে হয় ২৪%। তারা দাবী করে আলাদা দেশ পাকিস্তানের। সারা দেশ জুড়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে মুসলিম লীগ হিন্দু-শিখদের উপর চালায় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। গান্ধী, নেহেরু ও কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ মদতে ভারতের ২৭% জমি নিয়ে তারা আদায় করে পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে খুন হয় প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী। আর দেড়-কোটি মানুষ দুই পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে আসে ভারতে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা। তারা আজ আবার অশনি সংকেত দেখছে এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের।

**আপনার কাছে তাই আবেদন মুসলমানদের এই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত নীতি ঘোষণা করুন যাতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অন্তত ১৯৫১ সালের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।**

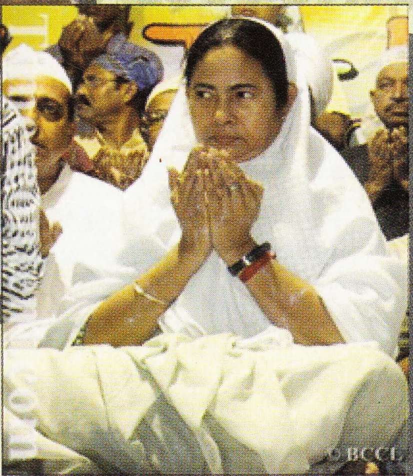
ভবদীয়
পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দ




মঙ্গলবার (৫ জুন, ২০১২) হজ হাউসে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, হজ কমিটিকে রাজারহাটে ১৫ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে।
সেখানে 'হজ টাওয়ার' তৈরি হবে।






© BCCL